মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

এপ্রিল ২০২৫
চৈত্র ১৪৩১-বৈশাখ ১৪৩২
শাওয়াল ১৪৪৬
বর্ষ ৪৪
সংখ্যা ০৭

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩
দারসুল কুরআন
‘স্বেচ্ছাচার ‘আদ জাতির করুণ পরিণতি’
প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ ॥ ৪
দারসুল হাদীস
আল্লাহর ভালোবাসা: দুনিয়ার মোহ ত্যাগের মাঝেই নিহিত
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ॥ ১৩
চিন্তাধারা
বিশ শতকের ইসলামী রেনেসাঁ এবং সৌদি আরব
আবুল আসাদ ॥ ২৩
ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস আস্‌সুন্নাহ
প্রফেসর এবিএম মাহবুবুল ইসলাম ॥ ৩৪
হিকমাহ: ইসলামী দাওয়াহ’র অন্যতম পদ্ধতি
ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম ॥ ৪৩
ধর্ম ও বিজ্ঞান ভাবনা
আব্দুল মান্নান ॥ ৫০
আন্তর্জাতিক
গাজায় যুদ্ধ চলছেই ॥ মীযানুল করীম ॥ ৫৪
প্রশ্নোত্তর ॥ ৫৯

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :

সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

দেশে ও বিদেশে পত্রিকা পাঠানোর ডাক খরচ

দেশের নাম	সাধারণ ডাক খরচ	রেজি: ডাক খরচ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

২. গ্রাহক চাঁদা পাঠাবার নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মানি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫, এম.এস.এ (ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা)-এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়। অথবা-
- ✳ ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০ নাম্বারে বিকাশ মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যায়।
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

রমযান উত্তর করণীয়

মাহে রমযান আমাদের থেকে বিদায় নিল। আমাদেরকে দিয়ে গেল অফুরন্ত বরকত ও কল্যাণ। আমরা যারা সকল বিধিনিষেধ মেনে যথানিয়মে সিয়াম পালন করেছি, আশা করা যায়, তারা তাদের গুনাহগুলো মাফ করে নিতে পেরেছি। যেহেতু রাসূল সা. বলেছেন, যারা ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে সিয়াম পালন করে তাদের অতীতের গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হয়।

সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। আর তাকওয়া হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজগুলো সচেতনভাবে বর্জন করে চলার নাম।

যারা সিয়ামে পানাহার বর্জনের সাথে সাথে নিষিদ্ধ কাজগুলো বর্জন করেন তারা গুনাহ মাফসহ সিয়ামের পূর্ণ ফায়দা লাভ করতে সক্ষম হন। কিন্তু যারা অন্যায় ও পাপাচার বর্জন না করে শুধু পানাহার বর্জন করেন, তাদের সিয়ামের কোন ফায়দা হয় না। কারণ রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও অন্যায় কাজ বর্জন করে না, তার পানাহার বর্জন করা আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

মোটকথা সিয়াম অন্যায় ও পাপাচার থেকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে ভালো মানুষ তৈরীর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সিয়ামের উদ্দেশ্য শুধু রমযান মাসে অন্যায় মুক্ত থাকা নয়, বরং এ প্রশিক্ষণকে ধারণ করে অন্যায় থেকে বিরত থাকাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে, যাতে বছরের অবশিষ্ট সময়ও অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা যায়। এজন্য প্রতিটি সিয়াম পালনকারীর উচিত সারা জীবন সিয়ামের শিক্ষা ধারণ করে অপরাধমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত ও পাপাচারমুক্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া। কারণ শুধু এক মাস ভালো থাকলে তাকে ভালো মানুষ বলা হয় না বরং যে ব্যক্তি সর্বদা সৎ ভাবে জীবন যাপন করে তাকেই ভালো মানুষ বলা হয়। সেজন্য রমযানের পরও মাঝে মাঝে সিয়ামের চর্চা করা প্রয়োজন। যেমন শাওয়াল মাসে ছয়টি, সোম ও বৃহস্পতিবার, প্রতি মাসের তিনটি, আশুরার সিয়াম ইত্যাদি পালন করা যেতে পারে।

যে জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেটিই হল মূল লক্ষ্য, প্রশিক্ষণ হলো সে লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক বিষয়। কোন ব্যক্তি যদি প্রশিক্ষণকে মূল লক্ষ্য মনে করে, তাহলে প্রশিক্ষণ দ্বারা তার কোন লাভ হবে না। যেমন সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কোন সৈনিক যদি প্রশিক্ষণকে মূল উদ্দেশ্য মনে করে এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং যুদ্ধের সময় যুদ্ধ না করে, তাহলে তার প্রশিক্ষণ দেশ ও জাতির কোন কল্যাণে আসবেনা। অনুরূপভাবে সিয়ামের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে অনুশীলনের মাধ্যমে খাঁটি মুসলিম, খাঁটি মানুষ হতে না পারলে সিয়ামের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। এ বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদের প্রত্যেককে রমযানের পরও রমযানের অনুশীলন অব্যাহত রাখতে হবে। ■

‘স্বেচ্ছাচার ‘আদ জাতির করুণ পরিণতি’

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ. الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ}

অনুবাদ: ‘আপনি কি দেখেননি আপনার রব ইরাম গোত্রের ‘আদ বংশের প্রতি কি (আচরণ) করেছিলেন, যারা সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী ছিল? যার সমতুল্য কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি’, [৮৯ আল ফাজ্‌র : ৬- ৮]।

নামকরণ: সূরাটির প্রথম আয়াতে উল্লেখিত ‘আল ফাজ্‌র’ শব্দটিকেই নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যার অর্থ প্রভাত বা উষা। ‘আরবীতে যাকে ‘সুবহে সাদিক’ বলা হয়। আল ফাজর বলেতে কি বোঝানো হয়েছে, সে বিষয়ে মুফাসসিরগণের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। ১. প্রত্যেক দিনের প্রভাতকালকে বোঝানো হয়েছে; কারণ প্রভাতকাল বিশ্বে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করে এবং আল্লাহ তা‘আলার অপার ক্ষমতার দিকে পথ প্রদর্শন করে। ২. বিশেষ দিন বোঝানো হয়েছে; কারো মতে সেই বিশেষ দিনটি হচ্ছে, মুহাররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল; কেননা এ দিনটি ইসলামের চন্দ্র বছরের শুরু। আবার কারো মতে যুলহাজ্জ মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল বোঝানো হয়েছে, [ইবন কাসীর ৮/৩৯০, ফাতহুল কাদীর ৫/৫২৬, দেখনু: কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর ২/২৮২০]।

নাযিলের সময়কাল: মাক্কী যুগের মধ্যভাগে নাযিল হয়। এসময় ইসলাম কবূলকারীদের উপর নানা ধরনের অকথ্য নির্যাতন শুরু হয়েছিল। এ সূরাতে ‘আদ, সামূদ ও ফির‘আউনের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে, [তাফহীমুল কুরআন ১৯/১০১, আল কুরআনের একশ চৌদ্দ সূরার তাৎপর্য, পৃ. ১৯০]।

মূল বিষয়বস্তু: দুনিয়াতে যে কেউ আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ, অন্যায়– অনাচার ও যুলম– অত্যাচারে লিপ্ত হবে তাদের প্রতি যে কোন সময় শাস্তি নেমে আসতে পারে। অপরদিকে সৎকর্মশীল মু’মিনদের শেষ পরিণতি নিশ্চিত শুভ হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও তাফসীর: মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে নানা বিষয়ের আলোচনা করেছেন, এগুলোর অন্যতম হচ্ছে উত্তম ঘটনাবলী ও বিভিন্ন বৃত্তান্ত। উদ্দেশ্য হচ্ছে এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা। আল্লাহর

সুন্নাতের (নীতির) কোন পরিবর্তন নেই যে, তিনি কুরআন কারীমে সেসব জাতির কথা, তাদের অবাধ্যতা, সীমালঘংন, ঔদ্ধত্য, অহমিকার বহিঃপ্রকাশ করে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করেছে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। অতীতের এসব জাতির অন্যতম হচ্ছে, 'আদ জাতি, যারা নূহ ('আ) এর ছেলে সামের পুত্র 'ইরাম' জাতির সাথে সম্পৃক্ত। তাদের বাসস্থান ছিল হিজাজ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী আল কুরা উপত্যাকায়। আলোচ্য আয়াতে সেই 'আদ জাতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ বাণী, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ 'আপনি কি দেখেননি আপনার রব ইরাম গোত্রের 'আদ বংশের প্রতি কি (আচরণ) করেছিলেন, যারা সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী ছিল?'। 'আদ জাতির বংশতালিকা উপরের দিকে 'ইরামে' গিয়ে মিলেছে। তাই আয়াতে বর্ণিত 'ইরাম' শব্দটি 'আদ ও সামূদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য। এখানে 'ইরাম' শব্দ ব্যবহার করে 'আদ গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম 'আদকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় 'আদের তুলনায় 'আদের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে 'আদে ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং সূরা আন্ নাজমের ৫০ নং আয়াতে **{وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى}** 'আর তিনি প্রথম 'আদ' জাতিকে ধ্বংস করেছেন'। এখানে 'প্রথম বা প্রাচীন 'আদ' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই 'আদ জাতিকে যাদের কাছে নবী হূদ 'আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছিল। অপরদিকে এই জাতির যেসব লোক শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে নিজেদের জাতির সমৃদ্ধ করেছিল, 'আরবের ইতিহাসে তাদেরকে 'দ্বিতীয় 'আদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রাচীন 'আদ জাতিকে 'আদে ইরাম' বলার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা সিরিয় বংশজাত 'আদদের সেই বংশ ধারার সাথে সম্পর্কিত, যাদের উদ্ভব হয়েছিল নূহ 'আলাইহিস সালামের নাতি ও সামের ছেলে 'ইরাম' থেকে। ইতিহাসে 'আদদের এই শাখার আরো কয়েকটি উপশাখা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। সামুদ জাতি এদের অন্যতম। [তাফসীরুল কুরতুবী ২০/৪৫, ফাতহুল কাদীর ৫/৫২৯, তাফহীমুল কুরআন ১৯/১০৬, আর দেখুন: কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ২/২৮২২]। আয়াতে 'আদ' জাতির বিশেষণে **ذَاتُ الْعِمَادِ** বলা হয়েছে। আর 'ইমাদ' অর্থ স্তম্ভ। তারা অতি দীর্ঘকায় জাতি ছিল বলে তাদেরকে **ذَاتُ الْعِمَادِ** বলা হয়েছে। কারো কারো মতে, তারা অট্টালিকায় বসবাস করত বিধায় তাদেরকে **ذَاتُ الْعِمَادِ** বলা হয়েছে। আর অট্টালিকা তৈরী করতে লম্বা স্তম্ভ তৈরীর প্রয়োজন হয়। এ জাতীয় অট্টালিকা তারাই প্রথম নির্মাণ করে। দুনিয়ায় তারাই সর্বপ্রথম উঁচু উঁচু পিলারের উপর ইমারত নির্মাণ করার কাজ শুরু করে। কুরআন কারীমের অন্য স্থানে তাদের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ.

'তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করছ, তোমরা অনর্থক করছ?', [২৬ আশ্ শু'আরা : ১২৮–১২৯]। অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ}

'আর তারা পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করত নিরাপদে', [১৫ আল হিজ্‌র : ৮২]।

এগুলোকেও তারা অহংকার, গর্ব ও বিদ্রোহ পোষণ করার জন্যই করতো। ফলে তাদের ওপর কঠিন শাস্তি আপতিত হয়। ওয়াদিউল হিজরে তাদের বসতভিটা অভিশপ্ত বলে পরিগণিত হয়। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الوَادِيَ

'তোমরা ওদের বাসস্থানে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছাড়া প্রবেশ করো না, যারা নিজেদের ওপর যুলম করেছে, যাতে তোমাদের প্রতি সে শাস্তি আপতিত না হয়, যা তাদের প্রতি পতিত হয়েছিল'। অতঃপর তিনি তার মাথা ঢেকে নেন এবং দ্রুত পথ চলে উপত্যাকাটি অতিক্রম করেন, [সাহীহুল বুখারী ৬/৭, নং ৪৪১৯, সাহীহ মুসলিম ৪/২২৮৬, নং ২৯৮০]। নিরাপদে থাকতে পাহাড় কেটে বাড়ি–ঘর বানানোর কথা অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখ রয়েছে। (সূরা আশ শো'আরা : ১৪৬-১৪৯, সূরা আল আ'রাফ : ৭৪)

আল্লাহ তা'আলার বাণী, الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ 'যার সমতুল্য কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি'। অর্থাৎ 'আদ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি–সাহস, শৌর্য– বীর্যে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। আল– কুরআনের অন্যান্য আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। 'আদ জাতির প্রতি অনুগ্রহের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

'তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য উপদেশ এসেছে? আর স্মরণ কর যে, আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের (ধ্বংসের) পরে তোমাদেরকে (তোমাদের আগের লোকদের) স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং সৃষ্টিতে তোমাদেরকে বেশী পরিমাণে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার', [৭ আল আ'রাফ : ৬৯]। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

{فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ}

'আর 'আদ জাতি, তারা যমীনে অযথা অহংকার করেছিল এবং বলেছিল, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে আছে? তবে তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, নিশ্চয় আল্লাহ, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আর তার আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত', [৪১ হা–মীম আস সাজদাহ : ১৫]।

'আদ জাতি সম্পর্কে উপরের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পর্যাপ্ত ধন–সম্পদ, সন্তানাদি ও বংশধরের আধিক্য, অফুরন্ত শস্য– ফসল, মনোমুগ্ধকর ঝর্ণা ও প্রস্রবণসমূহ দান করেছিলেন। তাদের প্রতি প্রেরীত নবী এসব অনুগ্রহের বিষয়ে

জাতির লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ}

'তিনি তোমাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র সন্তান, উদ্যান ও ঝর্ণাসমূহ দান করেছেন', [২৬ আশ্- শু'আরা : ১৩২- ১৩৩]।

কিন্তু তারা আল্লাহর এসব নি'য়ামতকে অস্বীকার করে এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহর 'ইবাদাত পরিত্যাগ করে দেব- দেবতা ও প্রতিমার পুজা করতে লেগে যায়। নূহ ('আ) এর সময়ে সংঘটিত তুফান ও মহাপ্লাবনের পরে এই 'আদ জাতিই প্রথম দেব-দেবতার 'ইবাদাত শুরু করে দেয়। আল্লাহ সুবহানাহু তাদের কাছে একজন সতর্ককারী, সুসংবাদ দানকারী নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন। নবী হূদ ('আ) তাদেরকে এক আল্লাহর নিরংকুশ 'ইবাদাত করার দিকে আহ্বান করেন। আল্লাহর 'আযাবের বিষয়ে সতর্ক করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ}

'আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই', [৭ আল আ'রাফ : ৬৫]। কিন্তু 'আদ জাতি তাকে পাত্তাই দিল না। তাকে হাসি-ঠাট্টার পাত্র বানিয়ে ছাড়ল। মিথ্যাবাদী বলে গালি দিল। এসব কথা কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে মহান আল্লাহ তুলে ধরেছেন। আল্লাহ বলেন,

{إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ}

'আমরা তো এটাই বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে', [১১ হূদ : ৫৪]। অর্থাৎ আপনি আমাদের দেবদেবী ও উপাস্যদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও বেয়াদবী করার কারণে আপনি তাদের কুনজরে পড়ে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে, তাই আপনি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন। বর্তমানে অনেক মানুষ তাদের পীর বা কবরের মানত বন্ধ করলে বা তাদের কবর পুজার বিরোধিতা করলে কোন কারণে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন এ ধরনের কথা বলে থাকে। তারা বলে যে, অমুক লোককে অমুক পীরের বদদু'আয় ধরেছে। অমুক কবরের অভিশাপে অমুক ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে শিরক। এটাকেই বলা হয় ভয়ের ক্ষেত্রে শিরক করা। এ ধরনের অজানা ভয়ই বর্তমানে অধিকাংশ শিরকের কারণ, [কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ১/১১৪৮]। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}

'তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা বলেছিল, নিশ্চয় আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় নিপতিত দেখছি। আর আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভূক্ত মনে করি', ৭ [আল আ'রাফ : ৬৬]। অর্থাৎ আমরা তোমাকে নির্বোধ মনে করছি যে, তুমি আমাদেরকে আমাদের দেবদেবী পরিত্যাগ করে তোমার এক আল্লাহর 'ইবাদত ও দাসত্ব করার জন্য দা'ওয়াত দিচ্ছ? বস্তুত 'আদ জাতির মতো কুরাইশ প্রধানগণও

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করাতে বিস্মিত হয়ে বলেছিল যে, 'এটা তো একটি আশ্চার্যের বিষয়'। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ}

'আর কাফিররা বলে, এ তো এক জাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি বহু ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? এটা তো এক অত্যাশ্চার্য ব্যাপার', [সোয়াদ- ৩৮: ৪- ৫]।

'আদ সম্প্রদায় স্পষ্ট করেই ঈমান না আনার ঘোষণা দিয়েছিল। অহংকার ও অহমিকা বশত তার দা'ওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা বলেছিল যে, যতই উপদেশ দাও কাজ হবে না। মহিমান্বিত আল্লাহ সে তথ্য তুলে ধরে বলেন,

{قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ. إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ}

'তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও বা না-ই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান। এটা তো কেবল পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব', [২৬ আশ্- শু'আরা : ১৩৬- ১৩৭]।

তারা কথা না মানার জন্য বাহানা করে বলল, মানুষ কেন নবী হবে! কোন নবী যিনি মানুষ, তার কথা মতো আমরা তো আমাদের উপাস্যদেরকে ছেড়ে দিতে পারি না। মহান আল্লাহ বলেন,

{قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ}

'তারা বলল, হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে হাজির হওনি। তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব না এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসীও নই', [১১ হূদ: ৫৩]।

করুণাময় আল্লাহ বলেন,

{مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ}

(তারা বলেছিল যে,) এ তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; তোমরা যা খাও, সে তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদের মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে', [২৩ আল-মু'মিনূন : ৩৩]। উল্লেখ্য যে, মানুষ নবী হতে পারে না এবং নবী মানুষ হতে পারে না, এ চিন্তাটি সর্বকালের পথভ্রষ্ট লোকদের একটি সম্মিলিত ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কুরআন মাজীদে বারবার এ গোমরাহ ধারণাটির উল্লেখ করে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং খুবই শক্তিশালীভাবে একথা বলা হয়েছে যে, সকল নবীই মানুষ ছিলেন এবং মানুষদের জন্য মানুষেরই নবী হওয়া বাঞ্ছনীয়, [বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন; আল-আ'রাফ: ৬৩-৬৯, ইউনুস: ২, হুদ: ২৭-৩১ ইউসুফ: ১০৯ ইত্যাদি, (আশ্ শানকীতি, আদওয়াউল বায়ান ২/৩৭৮, ৪/১৩৩, ৪/১৯০, ৬/১৮, ৬/৩৩৬, কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ২/১৮১৮- ১৮১৯)]।

তারা পরকাল, পুনরুত্থান এবং হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়াকে অস্বীকার করে। এ রকম কিছু সংঘটিত হওয়াকে একেবারেই অসম্ভব মনে করে তা প্রত্যাখ্যান করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ}

'তিনি কি তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে বের করা হবে? অসম্ভব, তোমদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব। একমাত্র দুনিয়ার জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই। আর আমরা পুনরুত্থিত হবার নই', [২৩ আল মু'মিনূন : ৩৫–৩৭]।

তারা অহংকার, ক্ষমতা ও শক্তিমত্তার দৌরাত্মে সৃষ্টিকর্তার অধিকার নষ্ট করে একইভাবে মানুষের হক ও অধিকারও নষ্ট করে। তারা দুর্বল মানুষদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করতো। তাদের উপর যুলম ও নির্যাতন করতো। অন্যায় – অবিচারের স্টিমরোলার চালাত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ}

'আর এ 'আদ জাতি, তাদের রবের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল এবং অমান্য করেছিল তাঁর রাসূলগণকে এবং তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করেছিল', [১১ হূদ : ৫৯]। আল্লাহ আর বলেন,

{وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ}

'আর যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক স্বেচ্ছাচারী হয়ে', [আশ্–শু'আরা– ২৬: ১৩০]। অর্থাৎ তোমরা ক্ষমতার দাপটে তরবারী দিয়ে মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা কর এবং চাবুক দিয়ে পিটিয়ে তাদের উপর নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত কর, [তাফসীরুল বাগাভী ৬/১২৩]।

তাদের এই অবাধ্যতা, অহংকার, আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ এবং মানুষের প্রতি যুলমের কারণে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাদের উপর প্রথম শাস্তি নাযিল করেন। তিন বছর পর্যন্ত পরপর বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত্র শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে–পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শিরক, মূর্তিপুজা ও কাল্পনিক দেব–দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করে না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘুর্ণিঝড়ের আযাব আঘাত করে। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও সুরম্য দালান –কোঠা মাটির সাথে মিশে যায়। মানুষ ও জীব–জন্তু শুন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর উপুর হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে 'আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তাই বলা হয়েছে যে, 'আদ জাতির শিঁকড় কেটে ফেলা হয়েছে'। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ}

'আর আমাদের আয়াতসমূহে যারা মিথ্যারোপ করেছিল এবং যারা মু'মিন ছিল না, আমরা তাদেরকে নির্মূল করেছিলাম', [৭ আল–আ'রাফ : ৭২]। অর্থাৎ তাদের নির্মূল

হওয়ার কারণ হচ্ছে; এক. আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা মনে করেছিল, আর দুই. তারা 'ঈমান না এনে কুফরী করেছিল, [ইবন 'আশূর, আত্ তাহরীর ওয়াত তানভীর ৮ বি/২১৫]। মহান আল্লাহ কুফরী, মিথ্যারোপ ও যুলমের কারণে অনেক জাতিকে নির্মূল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

'ফলে যালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহর জন্যই। [৬ আল–আন'আম : ৪৫]। এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, অত্যাচারী ও অপরাধীদের উপর শাস্তি নাযিল হওয়া সারা বিশ্বের জন্যই নি'য়ামাত। এ জন্যে মানুষের আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত, [কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ১/৬৪৪]।

মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ 'আদ জাতিকে কিভাবে নির্মূল করেছেন অন্যান্য আয়াতে তার বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। ফলে যমিনের উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষেতগুলো বালুকাময় ও লবনাক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাদের মাথার উপর মেঘমালা প্রেরণ করেন যা দেখে তারা আনন্দিত হয় যে, তাদের প্রতি তাদের কাঙ্খিত বৃষ্টি বর্ষিত হবে। মহান আল্লাহ সে ঘটনা তুলে ধরে বলেন,

{فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ}

'অতঃপর তারা যখন তাদের উপত্যাকার দিকে মেঘ আসতে দেখল তখন বলতে লাগল, এ তো মেঘ আমদেরকে বৃষ্টি দান করবে। না, বরং এটাই তো তা, যা তোমরা দ্রুত চেয়েছ, এক ঝড়, এতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এটা তার রবের নির্দেশে সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর তাদের পরিণাম এই হল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। এভাবে আমরা অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি', [৪৬ আল আহকাফ : ২৪– ২৫]। বৃষ্টি তাদের উপর একটানা সাত রাত ও আট দিন ক্রমাগতভাবে বর্ষিত হতে থকল। এক মূহুর্তের জন্য বন্ধ হলো না। প্রচন্ড ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হল। এর ফলে গাছ–পালা ও উদ্ভিদ সৃষ্টি হতো না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও শীতল হাওয়া ছিল, যাতে ছিল ভয়ংকর ও বিকট আওয়ায। মানুষকে উপরে উঠিয়ে আছড়ে মাথার উপর ফেলে দিত। ফলে শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এসব ভয়াবহ ঘটনার কথা তুলে ধরে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ}

'আর 'আদ জাতি, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাতরাত ও আটদিন বিরামহীনভাবে; তখন আপনি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতেন, তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য খেজুর কাণ্ডের ন্যায়। অতঃপর তাদের কাউকেও আপনি অবশিষ্ট দেখতে পান নি', [৬৯

আল-হাক্কাহ : ৬-৮]। এই সর্বাত্মক বিধ্বংসী শাস্তি থেকে হূদ ('আ) এবং তার সাথী মু'মিনদেরকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ}

'আর যখন আমাদের নির্দেশ আসল তখন আমরা হূদ ও তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমাদের অনুগ্রহে নাজাত দিলাম এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করলাম', [**১১** হূদ : ৫৮]। আল্লাহর এটি চিরন্ত নীতি যে, তিনি তাঁর প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানপোষণকারীদের রক্ষা করেন। যুগে যুগে তার দৃষ্টান্ত চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে।

এভাবে আল্লাহ স্বৈরাচার, অত্যাচারী, ফ্যাসিষ্ট ও আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও জাতিসমূহকে দুনিয়াতে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। আর পরকালেও তাদের জন্য আরও মারাত্মক স্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাদের উপর তাঁর অভিশাপ নিশ্চিত হয়েছে। আর এসব ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা তুলে ধরে পৃথিবীতে তাদের পরবর্তী জাতিসমূহকে সতর্ক করা হয়েছে এবং তাদের জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণের নিদর্শন হিসেবে জীবন্ত করে রেখেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ}

'তারপর আমরা তাদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনগুলোতে পাঠালাম, যাতে আমরা তাদের দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাতে পারি। আর আখিরাতের শাস্তি তো তার চেয়ে অধিক লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না', [৪১ হা-মীম আস্-সাজদাহ: **১৬**]।

মহান আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রবল ক্ষমতাধর, মহাপরাক্রান্ত, তাঁকে পরাস্ত ও পরাভূত করা যায় না, সকল ক্ষমতা তাঁর হাতেই কুক্ষিতগত। তাঁর সৈন্য-সামন্তও পর্যাপ্ত ও অগণিত, তিনিই কেবল তা জানেন। সুতরাং তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি যালিমদেরকে শাস্তি দেন, সে যত ক্ষমতাবান, দাম্ভিক ও শক্তিধর হোক না কেন তাকে শায়েস্তা করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। 'আদ জাতি দুনিয়াতে কত ক্ষমতাধর ছিল যে, তারা অহংকার করে বলত, আমাদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান আর কে আছে? কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রচন্ড ঝড়-তুফান দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এ প্রলয়ংকরী ঝড়ে তাদের বাড়ি-ঘর ধ্বসে গেল, গাছ-পালা উপড়ে পড়ল, গৃহ ছাদ উড়ে গেল, মানুষ ও সকল জীবজন্তু শূণ্যে উত্থিত হয়ে সজোরে যমীনে নিক্ষিপ্ত হল। এভাবেই সুঠাম দেহের অধিকারী শক্তিশালী জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। পক্ষান্তরে হূদ ('আ) ছিলেন দুর্বল, তার কোন ক্ষমতা ছিল না। তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলেন। তার অক্ষমতার বিষয়টিকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিলেন। মহান আল্লাহ তা তুলে ধরে বলেন,

{قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ}

'তিনি বলেন, হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন; কারণ তারা আমাকে

মিথ্যাপ্রতিপন্ন করছে', [২৩ আল মু'মিনুন : ৩৯]। আল্লাহ তা'আলা আর বলেন,

{إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ}

'নিশ্চয় আমি আমার ও তোমাদের রব আল্লাহর উপর নির্ভর করি', [১১ হুদ : ৫৬]। করুণাময় আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। তাকে উদ্ধার করেন, আর ক্ষমতাবান যালিম ও স্বৈরাচারকে ধ্বংস করে দেন। সুতরাং অতীত যুগের ঘটনা প্রবাহে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন ও শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}

'তাদের বৃত্তান্ত ও ঘটনাতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা আছে। এটা কোন বানানো ঘটনা নয় বরং এটা আগের গ্রন্থে যা আছে তার সত্যায়ন। ও সব কিছুর বিশদ বিবরণ, আর যারা ঈমান আনে এমন সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত রয়েছে', [১২, ইউসুফ: ১১১]। এতে নাবীদের কাহিনী, কাফির ও মুশরিকদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব ও আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির কথাও যেমন রয়েছে। তেমনি কাফির– মুশরিক, আল্লাহ ও তাঁর নাবী– রাসূল এবং তাদের অনুসারীদের দুশমনদের করুণ পরিণতি ও দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির কথাও রয়েছে।

শিক্ষাসমূহ: দারসে আলোচ্য আয়াতগুলোর অনেক শিক্ষা রয়েছে। নিম্নে কতিপয় শিক্ষা তুলে ধরা হলো;

এক. যুগে যুগে নাবী– রাসূল ও তাদের অনুসারী সত্যপন্থীদের সাথে সমকালীন দাম্ভীক, অহংকারী, স্বৈরাচার ও আল্লাহদ্রেহীদের দ্বন্ধ– সংঘাত অবশ্যাম্ভবী। বর্তমান যুগের সত্যপন্থীদের তা মেনে অপরিহার্য।

দুই. নাবী– রাসূল ও নিষ্ঠাবান মু'মিনগণকে তাদের দুশমনদের মোকাবেলায় সাহায্য করা এবং দুশমনদেরকে শায়েস্তা করা মহান আল্লাহর দায়িত্ব ও তাঁর স্থায়ী নীতি। এ কথা সন্দেহমুক্তভাবে মনে– প্রাণে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

তিন. মহান আল্লাহ পাপিষ্ঠ, অপরাধী, অহংকারী, দাম্ভীক, মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণকারী, অত্যাচারী, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিস্টদেরকে দুনিয়াতে কিছু সময়ের অবকাশ দিলেও তাদেরকে একেবারে ছেড়ে দেন না। দুনিয়াতেই তাদের জন্য কঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে আরও জঘন্য শাস্তি আরো কষ্টদায়ক আযাব। প্রত্যেক মানুষের এ চরম সত্য কথাটি মনে রাখা উচিত।

চার. সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর প্রকৃত তাওয়াক্কুল করা ও তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা মু'মিন বান্দাদের একান্ত জরুরী।

করুণাময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে আলোচ্য আয়াতের এ শিক্ষাগুলো বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

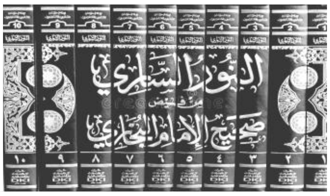

আল্লাহর ভালোবাসা : দুনিয়ার মোহ ত্যাগের মাঝেই নিহিত

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللَّهُ وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ.

অনুবাদঃ

সাহল ইবন সা'দ আস-সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালোবাসবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তুমি দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ থাকলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের কাছে যা আছে তুমি তার প্রতি নির্মোহ থাকলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে"।[১]

ব্যাখ্যাঃ

মহান আল্লাহ দুনিয়ার জীবনকে ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাতের জীবনকে স্থায়ী আবাস ঘোষণা করেছেন (সূরা আল-আনকাবূত, ২৯ : ৬৪)। দুনিয়া একদিকে অসংখ্য নি'আমতে পরিপূর্ণ, অপরদিকে তাতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমেই কেবল আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা যায়। আর আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনই যেহেতু মুমিন জীবনের একমাত্র লক্ষ, তাই আমরা দেখবো, কীভাবে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করে তাঁর বিরাগভাজন হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি। মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে 'যুহ্দ' (নির্মোহ) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

আয-যুহ্দ (**الزهد**) শব্দটি আরবী। এটি আর-রুগবা (তীব্র আকর্ষণ)-এর বিপরীত শব্দ। কোনো বস্তু কিংবা আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বল্পতা বোঝাতে যুহ্দ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। অন্য কথায় অল্পতে সন্তুষ্ট থাকা অর্থেও যুহ্দ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কাজেই এর অর্থ দাঁড়ায়- নির্মোহ থাকা, ঝুঁকে না পড়া। পারিভাষিক অর্থ- যুহ্দ বলতে এমন বস্তুর প্রতি নির্মোহ থাকা বোঝায়, যা আখিরাতে কোনো উপকারে আসে না (ইবন তাইমিয়া

---

১. ইবন মাজাহ, কিতাবুয-যুহ্দ, বাব : আয-যহদু ফিদ-দুনইয়া, হাদীসটি হাসান, নং ৪২৪১

র.)। ইবনুল জাওযী (র) বলেন, যুহ্দ বলতে অপেক্ষাকৃত উত্তম বস্তু বা বিষয় ধারণ করে অপেক্ষাকৃত অনুত্তমটি বর্জন করা বোঝায়। ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, দুনিয়ার বস্তুরাজির প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করে আখিরাতের প্রতি অধিক অনুরক্ত হওয়া বোঝায়। ইবনুল কায়্যিম (র) নিম্নোক্ত ভাগে যুহ্দকে বিন্যস্ত করেছেন : (১) হারাম কথা, কাজ ও বস্তু বর্জন করা। এটি ফরয; (২) সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি বর্জন করা; (৩) যে কোনো বাহুল্য বিষয়াদি বর্জন করা এবং (৪) যা কিছু আল্লাহর স্মরণবিমুখ করে তার প্রতি নির্মোহ থাকা। হাদীসে যুহ্দ-এর প্রকৃত সংজ্ঞা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে ওঠেছে। যেমন-

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَزْهَدُ النَّاسِ؟ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَنْسَ الْقَبْرَ وَالْبِلَى، وَتَرَكَ أَفْضَلَ زِينَةِ الدُّنْيَا، وَآثَرَ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، وَلَمْ يَعُدَّ غَدًا مِنْ أَيَّامِهِ، وَعَدَّ نَفْسَهُ فِي الْمَوْتَى-

আদ-দাহ্হাক ইবন মুযাহিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি নবী (স)–এর নিকট এসে বললো : হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে কে সর্বাধিক নির্মোহ? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কবরের ধ্বংসাত্মক জীবনের কথা ভোলে না, দুনিয়ার অধিক শোভা-বিলাসিতা বর্জন করে চলে, অবিনশ্বর জীবনকে নশ্বর জীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়, আগামীকালকে নিজ জীবনের অংশ মনে না এবং নিজকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করে"।[২]

عن ثوبان قال قلت يا رسول الله مايكفيني في الدنيا فقال ما سد جوعتك ووارى عورتك وإن كان لك بيت يظلك فذاك وإن كانت لك دابة فبخ

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : "হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়ায় আমার কী পরিমাণ সম্পদ থাকা সমীচীন মনে করেন? তিনি বলেন, যতটুকু তোমার ক্ষুধা নিবারণ করে এবং তোমার লজ্জা নিবারণের জন্য প্রয়োজন। যদি ছায়া দেয়ার মতো তোমার একটি ঘর থাকে, তবে তা-ই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যদি বাহন থাকে, তবে তা খুবই ভালো"।[৩]

আশা করি, উপরোক্ত বর্ণনা থেকে যুহ্দ সম্পর্কে যৎসামান্য ধারণা লাভ করা যাবে।

দুনিয়ার বস্তু সামগ্রীর প্রতি মোহগ্রস্ত হওয়া সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

স্বভাবজাত কারণে মানবমন দুনিয়ার প্রতি প্রবল আসক্ত এবং আখিরাতবিমুখ। এ অবস্থা স্থায়ী হলে ধীরে ধীরে অন্তরে মরিচা পড়ে এবং অন্তর কঠিন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন-

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ . كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ . ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ .

---

২. আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, কিতাবুত তাওবা ওয়ায-যুহ্দ, বাব : আত-তারগীব ফিদ-দুনইয়া ওয়াল ইকতিফা মিনহা বিল-কালীল ওয়াত তারহীবু মিন হুব্বিহা।

৩. তাবারানী, নং ৯৩৪৩

"কখনো নয়, বরং তারা যা কিছু উপার্জন করেছে তা তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে। কখনো নয়, সেদিন তাদেরকে তাদের রবের দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখা হবে। অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে"।[৪]

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ . حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ . كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ...

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। একাজ সংগত নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে"... ।[৫]

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ . قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.

"নারী, সন্তান, রাশিকৃত সোনা-রুপা এবং চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আকর্ষণ মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যসামগ্রী। অথচ আল্লাহ, তাঁর নিকটে রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। বলো, আমি কি তোমাদেরকে এসব বস্তু থেকে উৎকৃষ্টতর কোনো কিছুর সন্ধান দিবো না? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য জান্নাতসমূহ রয়েছে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গিগণ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে সন্তুষ্টি। আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা"।[৬]

وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا-

"তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না। তুমি তার আনুগত্য করবে না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।[৭]

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ -

"আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি তোমার দু'চোখ প্রসারিত করবে না। তাদের জন্য তুমি দুঃখ প্রকাশ করবে না। তুমি মুমিনদের জন্য তোমার পক্ষপুট অবনমিত করে দিবে"।[৮]

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى-

---

৪. সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৮৩ : ১৩-১৬
৫. সূরা আত-তাকাসুর, ১০২: ১-৩
৬. সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৪-১৫
৭. সূরা আল-কাহ্ফ, ১৮ : ২৮
৮. সূরা আল-হিজ্র, ১৫ : ৮৮

"তুমি তোমার দু'চোখ কখনো প্রসারিত করবে না সেসবের প্রতি, যা আমি বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনে সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তা দ্বারা তাদের পরীক্ষা করার জন্য। আর তোমার রবের দেয়া রিযিকই সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী"।[৯]

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

"তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া- কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকারপ্রদর্শন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। এর উপমা বৃষ্টি, যদ্দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তা হলুদবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়"।[১০]

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ.

"যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তারই কিছু দেই, আখিরাতে তার জন্য কিছু থাকবে না"।[১১]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ.

"হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো এবং ভয় করো সেদিনের, যখন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না, সন্তানও উপকারে আসবে না তার পিতার। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেনো তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেনো তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে"।[১২]

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি লালায়িত হয়ে আখিরাতের অনন্ত জীবন ভুলে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বরং বুদ্ধিমানের কাজ হবে, আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ধৈর্যের সাথে মানবীয় চেষ্টা করা।

---

৯. সূরা ত্বাহা, ২০ : ১৩১
১০. সূরা আল-হাদীদ, ৫৭ : ২০
১১. সূরা আশ-শূরা, ২০ : ৪২
১২. সূরা লুকমান, ৩১ : ৩৩

এবিষয়ে হাদীসেও ব্যাপক নির্দেশনা রয়েছে। যেমন-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « إِذَا أَرَدْتِ اللُّحُوقَ بِى فَلْيَكْفِيكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الأَغْنِيَاءِ وَلاَ تَسْتَخْلِقِى ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ .

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন: "তুমি আমার সান্নিধ্য লাভ করতে চাইলে দুনিয়ার সম্পদের এতো পরিমাণ যথেষ্ট মনে করো, যে পরিমাণ সম্পদ পাথেয় হিসেবে একজন মুসাফিরের জন্য যথেষ্ট, তুমি ধনীদের সাথে ওঠাবসা করা থেকে বিরত থাকবে এবং কাপড়ে তালি না দেয়া পর্যন্ত তা পুরানো (ব্যবহার অনুপযোগী) মনে করবে না"।[১৩]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْىٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ « أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ ». فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَىْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ « أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ». قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لأَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ « فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ .

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। "একদা রাসূলুল্লাহ (স) বাজারের ওপর দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। এসময় তাঁর উভয় পাশে বেশ কিছু লোক ছিলো। তিনি ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর নিকট পৌঁছেন, অতঃপর তিনি সেটির কান ধরে বলেন, তোমাদের কেউ কি এটি এক দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করবে? তারা বললো, কোনো কিছুর বিনিময়ে আমরা তা নিতে আগ্রহী নই এবং তা নিয়েই বা আমরা কী করবো? তিনি বলেন, তোমরা কি বিনা পয়সায় তা নিবে? তারা বললো, আল্লাহর শপথ! সেটি জীবিত হলে হতো, তাও তো সেটি ত্রুটিযুক্ত। সেটির কানগুলো ছোট ছোট। আর এখন সেটি তো মৃত, কাজেই আমরা তা কীভাবে গ্রহণ করবো? পরিশেষে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এটি তোমাদের নিকট যতোটা তুচ্ছ, আল্লাহর নিকট দুনিয়া এর চেয়েও অধিকতর তুচ্ছ"।[১৪]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَدْ أَلْقَاهَا أَهْلُهَا فَقَالَ « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا ».

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) এমন একটি মৃত গাধার নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করেন, যার মালিক সেটি ফেলে দিয়েছে। তিনি বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! এ মৃত বকরীটি তার মালিকের নিকট যেমন তুচ্ছ, আল্লাহর নিকট দুনিয়া তার চেয়েও অধিক তুচ্ছ"। [১৫]

---

১৩. তিরমিযী, কিতাবুল লিবাস, বাব : মা জাআ ফী তারকীবুস-সাওব।

১৪. মুসলিম, কিতাবুয-যুহ্দ, বাব :----, নং ৭৬০৭

১৫. মুসনাদ আহমাদ, নং ৩১০৩

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله – ﷺ " من أشرب قلبه حب الدنيا التاط منها بثلاث : شقاء لا ينفد عناه ، وحرص لا يبلغ غناه ، وأمل لا يبلغ منتهاه . فالدنيا طالبة ومطلوبة ، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه ، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه .

আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : " যার অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা ঢেলে দেয়া হয়েছে, সে দুনিয়ার তিনটি বস্তুর সাথে জড়িয়ে পড়েছে : (১) এমন দুর্ভোগ, যার কষ্ট শেষ হবার নয়; (২) এমন লোভ, যা থেকে সে মুক্তি পায় না এবং (৩) এমন উচ্চাভিলাষ, যার শেষ সীমানায় সে পৌঁছতে পারে না। দুনিয়া অন্বেষী ও অন্বেষিত। যে ব্যক্তি দুনিয়া অন্বেষণ করে, আখিরাত তাকে খোঁজ করবে। অতঃপর তার মৃত্যু হলে আখিরাত তাকে পাকড়াও করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আখিরাত খোঁজ করে, দুনিয়া তাকে খোঁজ করে। ফলে সে তার দুনিয়ার রিযিক পুরোপুরি ভোগ করে"।[১৬]

عن أبي هريرة قال قال رسول الله : ما ذئبان ضاريان جائعان باتا في زريبة غنم أغفلها أهلها يفترسان ويأكلان بأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم –

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : "সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি আকর্ষণ একজন মুমিনের জন্য দীনের ক্ষেত্রে যতোটা ক্ষতিকর, বকরী পালে ঘাপটি মেরে থাকা দুটি ক্ষুধার্ত হিংস্র বাঘ তার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর নয়,যার মালিক ঘুমিয়ে পড়েছে। ফলে বাঘ দুটি বকরীগুলোকে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলেছে"।[১৭]

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– ...« أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَىْءٍ » . قَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ ، فَوَاللَّهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ .

আল-মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : ..."আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ আবূ উবায়দা তোমাদের জন্য কিছু নিয়ে এসেছে। তারা বললো, হাঁ; হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং যা তোমাদের আনন্দ দেয় তার আশা রাখো। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্রের আশংকা করি না, বরং আমি তোমাদের ব্যাপারে ভয় করি যখন দুনিয়াকে তোমাদের ওপর প্রশস্ত করে দেয়া হবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের

১৬. মু'জামুল কাবীর, নং ১০৩২৮
১৭. মু'জামুল আওসাত, নং ৭৭২

প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিলো। ফলে তোমরা তার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে, যেমন তারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আর তা-ই তোমাদের ধ্বংস করবে, যেমন তাদের ধ্বংস করেছিলো"।[১৮]

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ) (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) . وَقَالَ عَلِيٌّ ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً ، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً ، وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلاَ حِسَابَ ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلَ .

মহান আল্লাহর বাণী –"যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়" (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৮৫); মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, "তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা খেতে থাকুক এবং আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক, অচিরেই তারা (পরিণাম) জানতে পারবে" (সূরা আল-হিজ্‌র, ১৫ : ৩)। আলী (রা) বলেন, দুনিয়া পেছনের দিকে চলছে এবং সামনের দিক থেকে আসছে। মানুষ এদুটি জায়গাই একান্তভাবে কামনা করে। তবে তোমরা আখিরাত কামনা করো,দুনিয়া কামনাকারী হয়ো না। আজকের দিন (দুনিয়ায়) আমল করার সুযোগ আছে, হিসাব নেই। আর কাল (আখিরাত) সিাব আছে, আমলের সুযোগ নেই"।[১৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ – ﷺ – قَالَ « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ.

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ধ্বংস হোক দীনারের দাস, দিরহামের দাস এবং পেট পুজারীরা। দান করা হলে সে সন্তুষ্ট হয় এবং না দিলে সে ক্ষুব্ধ হয়। তারা ধ্বংস ও অপমানিত হোক। সে কাঁটা বিদ্ধ হলে কেউ তাকে তুলে দিবে না। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধরে রয়েছে, যার মাথার চুল উস্কখুস্ক এবং দুই পা ধুলামলিন। তাকে পাহারায় নিয়োজিত করলে সে পাহারায় থাকে এবং দলের পেছনে রাখলে পেছনেই থাকে। সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না এবং সে কোনো সুপারিশ করলে তার সুপারিশও গ্রহণ করা হয় না"।[২০]

---

১৮. বুখারী, কিতাবুল জিযইয়া, বাব : আল-জিযইয়াতু ওয়াল মু'আদা'আতু মা'আ আহলিল-হারব।
১৯. বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব : ফিল-আমালি ওয়া তাওলিহি।
২০. বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব : আল-হিরাসাতুফিল-গাযয়ু ফী সাবীল্লিাহ।

عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى .

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : "যে ব্যক্তি তার দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করলো সে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করলো। সুতরাং যা ধ্বংসশীল তার ওপর স্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দাও"।[২১]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لاَ دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لاَ مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لاَ عَقْلَ لَهُ .

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : "যার (আখিরাতে) ঘর নেই, দুনিয়াই তার ঘর। যার আখিরাতে সম্পদ নেই, দুনিয়ার সম্পদই তার সম্পদ। যার বুদ্ধি নেই, কেবল সেই সম্পদ সঞ্চয় করে"।[২২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ – رضى الله عنهما – قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ – بِمَنْكِبِى فَقَالَ « كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, "তুমি পৃথিবীতে আগন্তুক অথবা পথিকের ন্যায় জীবন-যাপন করো। ইবন উমার (রা) প্রায়শই বলতেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকলে সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করো না। আর সকল পর্যন্ত বেঁচে থাকলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করো না। এবং সুস্থতা থেকে রোগাক্রান্ত অবস্থার জন্য ও জীবন থেকে মৃত্যুর জন্য কিছু নিয়ে নাও"।[২৩]

عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ -ﷺ- يَقُولُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِى أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِى أَىِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ.

আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন: "আমি তোমাদের নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি: "যার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হবে আখিরাত, তার পার্থিব কাজকর্মের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তায় মোহগ্রস্ত থাকে তার যে কোনো উপত্যকায় বা প্রান্তরে ধ্বংস হয়ে যাওয়াতে আল্লাহর কোনো পরোয়া নেই"।[২৪]

---

২১. মুসনাদ আহমাদ, নং ২০২২৮
২২. মুসনাদ আহমাদ, নং ২৫১৫৩
২৩. বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব: ৩
২৪. ইবন মাজাহ, কিতাবুয-যুহ্দ, বাব : আল-হাম্মু বিদ-দুনইয়া।

তবে যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি মোহগ্রস্ত নয় সে পরম সৌভাগ্যবান। যেমন-

عَنْ أَبِي خَلاَّدٍ – وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ–إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ.

আবূ খাল্লাদ-তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবী। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : "তোমরা কোনো ব্যক্তিকে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ এবং স্বল্পভাষী দেখলে তার সাহচর্য গ্রহণ করবে। কেননা তাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে"।[২৫]

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ যাকে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ হওয়ার গুণাবলি দান করেছেন সেই ভাগ্যবান আর যে দুনিয়ার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সে সর্বাধিক হতভাগা।

আমাদের করণীয়

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা কারো একথা মনে করার কারণ নেই যে, আমরা সামগ্রিকভাবে দুনিয়া বিমুখ থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করছি। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার যেমন সামগ্রিকভাবে দুনিয়াদার হয়ে আখিরাতের অনন্ত জীবনের কথা ভুলে যাবো না, তদ্রূপ বৌরাগ্যবাদেও উদ্বুদ্ধ হবোনা। বরং আমাদের জীবন হবে ভারসাম্যপূর্ণ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়েছেন- 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো" (সূরা আল-বাকারা, ২ : ২০১)। অন্যত্র বলেন-'আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তদ্দারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না'... (সূরা আল-কাসাস, ২৮ : ৭৭)।

শিক্ষা :

(১) দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ থাকা নবী-রাসূলগণের বৈশিষ্ট্য।
(২) আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার ক্ষেত্রে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ থাকা গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ।
(৩) দুনিয়ায় মানসিক প্রশান্তি এবং আখিরাতে সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া যায়।
(৪) দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ এবং তৎপ্রতি ঝুঁকে পড়া নির্বোধের কাজ।
(৫) অন্তর কলুষমুক্ত হয় এবং পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়।
(৬) শয়তান, দুনিয়া ও দুনিয়াপুজারী হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।
(৭) আখিরাতের জীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করা কর্তব্য।

মহান আল্লাহ উপরোক্ত হাদীসের আলোকে আমাদের জীবন গঠন করার তাওফীক দিন। আমীন। ■

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

---

২৫. ইবন মাজাহ, কিতাবুয যুহ্দ, বাব : আয-যুহ্দু ফিদ-দুনইয়া।

২২ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

বিশ শতকের ইসলামী রেনেসাঁ এবং সৌদি আরব

আবুল আসাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বস্তুত বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাবেতা আলম ইসলামি, ওয়াল্ড এসেমবলি অব মুসলিম ইয়ুথ এবং ওআইসি গঠন বিশ শতকে ইসলামি রেনেসাঁর প্রধান নিমিত্ব হিসাবে কাজ করে। উল্লেখ্য উপনিবেশিক শাসনের অধীন এবং স্বাধীন মুসলিম জাতি রাষ্ট্রগুলোতে বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনের মাধ্যমে ইসলাসি রেনেসাঁ ও মুসলিম জাগরণের কাজ চলছিল, যার লক্ষ্য ছিল ইসলামি জীবন ব্যবস্থার উজ্জীবন এবং পরাধীনতা থেকে মুক্তি লাভ। ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া অঞ্চলে মুহাম্মাদিয়া আন্দোলন, দক্ষিণ এশিয়ায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী ও সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর (রঃ) আন্দোলন, আরব অঞ্চলে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব ও হাসানুল বান্নার আন্দোলন, তুরস্ক ও মধ্য এশিয়ায় বদিউজ্জামান নুরসির আন্দোলন এবং উত্তর আফ্রিকার সেনুসি আন্দোলন এই ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। অঞ্চল ও জাতি রাষ্ট্র ভিত্তিক এই রেনেসাঁ আন্দোলনগুলোকে রাবেতা আল আলম ইসলামি, ওয়াল্ড এসেমবিলি অব মুসলিম ইয়ুথ এবং ওআইসি আন্তর্জাতিক রেনেসাঁ আন্দোলনের একক একটি ধারায় গ্রথিত করে। অঞ্চল ও জাতি রাষ্ট্র ভিত্তিক আন্দোলনের পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিশ্বের সব মুসলিমের কাছে পৌঁছা সম্ভব ছিল না। রাবেতা আল আলম ইসলামি, ওআইসি এবং ওয়ামির (WAMY) পক্ষে তার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বিশ্বের সব মুসলমানের কাছে পৌঁছা সম্ভব হয়। রাবেতা, ওয়ামি ও ওআইসি'র এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো, 'ওয়াল্ড সুপ্রিম কাউন্সিল ফর মস্ক', 'আন্তর্জাতিক ফেকা কাউন্সিল', 'ইন্টারন্যাশনাল রিলিফ অর্গানাইজেশন', 'মক্কা চ্যারিটি ফাউন্ডেশন', 'আলহারামাইন এন্ড আল আকসা চ্যারিটি ফাউন্ডেশন', 'ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর কুরআন মেমোরাইজেশন', 'ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর এডুকেশন; স্ট্যাটিসটিক্যাল ইকোনোমিক', 'সোসাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার ফর ইসলামিক কান্ট্রিস (এসইএসআরআইসি)', 'রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলামিক হিসটোরি', 'আর্ট এন্ড কালচার (আই আর সি আই সি এ)', 'ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (আই ইউ টি)', 'ইসলামিক সেন্টার ফর দা ডেভলোপমেন্ট অব ট্রেড (আই সি ডি টি)', 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফিক একাডেমি (আই আই এফ ক এ)', 'ইসলামিক সলিডারিটি ফান্ড এন্ড ওয়াকফ (আই এস এফ)', 'ইসলামিক ডেভলোপমেন্ট ব্যাংক (আই ডি বি)', 'ইসলামিক এডুকেশন্যাল সাইন্টিফিক এন্ড কালচার অর্গানাইজেশন (আই সি ই এস সি ও)', 'ইসলামিক ব্রোডকাস্টিং ইউনিয়ন (আই বি ইউ)', 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক নিউজ এজেন্সি (আই এন এ)', 'ইসলামিক কমিটি অব দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিসেন্ট (আই সি আই সি)'। রাবেতা,

ওআইসির এই সংগঠনগুলো নামের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করা, তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সজ্জিত করা, তাদের বিকৃতি ও বিপদগামিতাকে পরিশুদ্ধ করা, তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপকরণে সজ্জিত করাসহ ইসলামি রেনেসাঁ ও মুসলিম জাগরণের জন্য যা প্রয়োজন তার সবই এর মধ্যে রয়েছে।
প্রশ্ন উঠতে পারে এবং এ প্রশ্ন উঠেই থাকে যে, রাবেতা এবং ওআইসি'র অবদান কি? বাহারি নামের কাগুজে কর্মসূচি ছাড়া আসলেই তাদের কোনও কাজ আছে কি? এ প্রশ্নগুলোর সংগত কারণ আছে। পিছনে শক্তিশালী যুক্তিও রয়েছে। ওআইসি এখন অর্ধশতাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের সংগঠন। কিন্তু বাস্তবে তারা কি করতে পারছে? আফগানিস্তান তাদের সদস্য রাষ্ট্র, ইরাকও। আফগানিস্তান, ইরাক তাদের সামনে ধ্বংস যজ্ঞের শিকার হয়েছে। ওআইসি কিছুই করতে পারেনি। ওআইসির চোখের সামনে ইন্দোনেশিয়া থেকে পূর্ব তিমুরকে এবং সুদান থেকে দক্ষিণ সুদানকে বিচ্ছিন্ন করে খৃষ্টানদেরকে আলাদা রাষ্ট্র দেয়া হলো। কিন্তু কাশ্মিরীরা, ফিলিপাইনের মিনদানাও বাসিরা এবং ফিলিস্তিনিরা ষাট বছরেরও বেশি কাল ধরে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে স্বাধীনতা তো পেলই না এখনও, উপরোন্ত তারা এখন নির্মূলের শিকার। ওআইসি তাদের কোনই উপকারে আসেনি। এই অভিযোগগুলোর প্রত্যেকটাই সত্য। কিন্তু ওআইসি'র অক্ষমতার জন্য ওআইসি কতটুকু দায়ী? ওআইসি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটা সংগঠন মাত্র। মুসলিম রাষ্টগুলো একমত হয়ে যে সিদ্ধান্ত নিবে সেটাই ওআইসি'র সিদ্ধান্ত। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কি ইরাক, আফগানিস্তান, মিন্দানাও, তিমুর, দক্ষিণ সুদান, ফিলিস্তিন সমস্যার ব্যপারে যে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত সে সিদ্ধান্ত কি নিতে পেরেছে? পারেনি। না পারার কারণ হলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আভ্যন্তরীন, বৈদেশিক নানা কারণে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মপন্থি হওয়ার বদলে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নানা কারণে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিভিন্নপন্থি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা সিদ্ধান্তের জন্য স্বদেশ, স্বজাতি স্বধর্মের প্রতি না তাকিয়ে ডান-বাম, পূর্ব-পশ্চিমে তাকিয়ে থাকে। এ দোষ ওআইসি'র নয়। আসলে আমরা যে ওআইসি চাই তার জন্যে যে ধরনের রাষ্ট্র-সদস্য দরকার, আমাদের অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র সে অবস্থায় এখনও পৌঁছতে পারেনি। পৌঁছতে পারবে না এ কথাটি ঠিক নয়। ইসলামি রেনেসাঁ উৎপন্ন প্যাকেটজাত কোনও পণ্য নয়। ইসলামি রেনেসাঁ একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া মুসলিম জাতি-রাষ্ট্রগুলোতে জনগণের মধ্যে এবং জনগণের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে। রাবেতা এবং ওআইসি'র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এরই বীজ বপন করেছে এবং করছে। এই বীজ থেকে উপ্ত গাছ যখন ফুলে, ফলে সুসোভিত হবে তখনই মুসলিম জাতি-রাষ্ট্রগুলো ওআইসি'কে আমাদের বাঞ্ছিত ওআইসি হিসাবে গড়ে তুলবে।
যারা হতাশ হন, যারা রাবেতা ও ওআইসি'র কোনও কাজই দেখতে পান না, তারা তাদের দৃষ্টিকে দুনিয়ার মুসলিম জনপদের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনা দরকার। প্রশান্ত মহাসাগরের অথৈই পানিতে হারিয়ে থাকা অজানা অচেনা দ্বীপে গেলে তারা সুমুধুর সুরের আজান শুনবেন, সুন্দর মসজিদ দেখবেন, বালক-বালিকার কলরব মুখর মাদরাসা

তাদের চোখে পড়বে। তার সাথে দেখবেন তারা দেশ দুনিয়া সম্পর্কে সচেতন হওয়া মুসলিম জাতি। তিরিশ বছর আগে, পঞ্চাশ বছর আগে এই দ্বীপগুলোতে এসবের কিছুই ছিল না। রাবেতার মতো সংগঠনগুলো তাদের খুঁজে বের করেছে। তাদেরকে জানিয়েছে তারা অসহায় নয়, অবহেলিতও নয়। আফ্রিকার গহীন জঙ্গলে নাম না জানা গোত্রগুলোর কাছে গেলে এই দৃশ্যই দেখা যায়। যারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় ছাড়া আর কিছুই জানতো না, এমনকি তাদের রাসূলের নাম পর্যন্ত নয়। সেখানে আজ মসজিদ গড়ে ওঠেছে, মাদরাসা গড়ে ওঠেছে, তাদের ভাষায় কুরআন অনুদিত হয়েছে। গৌরবান্বিত মুসলিম জাতির অংশ হিসাবে আজ তারা সচেতন। রাবেতা এবং রাবেতার ছত্রছায়ায় দানশীল বহু ব্যক্তি ও পরিবারের সাহায্য, সহযোগিতায় এটা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া শুধু অজানা অচেনা মুসলিম জনপদের কথাই নয়। চীন, রাশিয়ায় ভাঙ্গা মসজিদ বিনির্মাণে, ইন্দোচীনের রাজ্যগুলোতে সুযোগ বঞ্চিত অসহায় মুসলিম জনপদে মসজিদ মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় রাবেতার মতো সংগঠনই এগিয়ে এসেছে। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা যেখানেই যাওয়া যাবে, সেখানেই এই দৃশ্য দেখা যাবে। এই কাজগুলো ইসলামি রেনেসাঁরই বুনিয়াদ। রাবেতা এবং ওআইসি'র সংগঠনগুলো দেখাবার মতো আকাশচুম্বি কিছু করতে না পারলেও ইসলামি রেনেসাঁর এই বুনিয়াদ তারা রচনা করেছে। বিশ শতকের শেষ দিকে এসে এবং আজ একুশ শতকের সূচনায় বিশ্বব্যাপী যে মুসলিম জাগরণ আমরা দেখছি তা এই বুনিয়াদ রচনারই ফল। জাতি-রাষ্ট্রভিত্তিক ইসলামি আন্দোলনগুলো সামগ্রিক এই মুসলিম জাগরণের একটি করে স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলোর ওপরই দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ব ইসলামের রেনেসাঁ-প্রসাদ।

বিশ্ব ইসলামের এই রেনেসাঁ যত দ্রুত এগোনোর কথা ছিল তত দ্রুত এগুতে পারেনি। রাবেতা, ওআইসি কোনও সংগঠনই তাদের সাধ্য যতটুকু, ইসলাম ও মুসলিম জাগরণের স্বার্থে ততটুকু এগিয়ে আসার পথে নানা ভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এর সংগত কারণও রয়েছে। আসলে রাবেতা এবং ওআইসির মতো সংগঠন গঠিত হবার পর তা মুসলমানদেরকে যতখানি সচেতন করেছে তারচেয়ে অনেক বেশি সাবধান করেছে পশ্চিমের কিছু রাষ্ট্র ও জাতিকে যারা মুসলমানদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। ওআইসির গঠন তাদেরকে বিস্মিত করেছে। তারা ভেবে পায়নি যে সেকুলার, আধাসেকুলার, সমাজতন্ত্রি এ ধরনের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কিভাবে সৌদিআরবের ডাকে সারা দিয়ে ইসলামের নামে, ইসলামের উজ্জীবন-লক্ষ্যে এবং ইসলামের বাধনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা রাষ্ট্রসংস্থা গঠন করল। খোদ এই উদ্দ্যোগ এবং সিদ্ধান্তকেই ঐতিহাসিক এক বিস্ময় হিসাবে তারা ধরে নিয়েছে। এই ধরনের সংগঠন সামনে কি করতে পারে এই চিন্তা তাদেরকে আতঙ্কিত করেছে। এই আতঙ্ক তাদের বাড়িয়ে দেয় তুরস্কের ইস্তামবুলে অনুষ্ঠিত ইসলামি দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের একটি সিদ্ধান্ত। ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে হিজরী পঞ্চদশ শতককে 'ইসলামের শতক' হিসাবে স্বাগত জানানো হবে। মুসলিম দেশগুলোর বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে বছর ধরে এই শতককে স্বাগত জানাবে এবং বছর শেষে এক মাসব্যাপী সাংকৃতিক উৎসবের

আয়োজন হবে নবীর (সা) শহর মদীনা মনওয়ারায়। শেষ হবে মক্কা মুকাররমায় 'মক্কা ঘোষণা'র মাধ্যমে। এই সিদ্ধান্ত বলা যায় পশ্চিমী কিছু দেশকে হতবাক করে দেয়। তারা ভাবতেই পারেনি তাদের অনুগত বা আধাঅনুগত অথবা সাহায্যপুষ্ট কিছু মুসলিম রাষ্ট্রের সম্মিলিত রাষ্ট্রসংস্থা কিভাবে একটি শতককে 'ইসলমি শতক' ঘোষণা করতে পারে। তারা স্বপ্নেও যা ভাবতে পারেনি তাকে বাস্তবরূপে সামনে দেখে তারা কিছু করার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। এখান থেকেই মুসলিম জাগরণের পথে তাদের বাধাদানের কর্মসূচী নতুনভাবে শুরু হয়।

এই সময় দু'টি ঘটনা বা পরিবর্তন খুবই দৃষ্টি গোচর ছিল এবং দু'টি ঘটনা বা পরিবর্তনের ক্ষেত্র ছিল ইসলামি রেনেসাঁর কেন্দ্র সৌদি আরব এবং আরববিশ্ব। তার একটি হলো পবিত্র কাবা অবরোধ করে বাদশা খালেদকে পণবন্দি করার ষড়যন্ত্র আর দ্বিতীয়টি হলো শিয়া-সুন্নি বিরোধ উস্কে দিয়ে মুসলিম বিশ্ব ও ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলনকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র। প্রথমটি দ্বারা রাবেতা এবং ওআইসি'র কার্যতঃ প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ শতকের ইসলামি রেনেসাঁর পতাকাবাহী সৌদি আরবকে ভিতর থেকে অভ্যন্তরীন সমস্যায় জড়িয়ে ফেলার চক্রান্তমূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়। আর দ্বিতীয়টি সুদূর প্রসারী। আমার টেবিলে পশ্চিম এশিয়ার একটি মানচিত্র আছে। যত দূর মনে পড়ে মানচিত্রটি বিখ্যাত মার্কিন কলাম লেখক নোয়ান চমস্কির একটি আর্টিকেলের অংশ। এই মানচিত্রে পাকিস্তান থেকে শুরু করে লোহিত ও ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোকে ভেঙ্গে চুরে নতুন একটা রূপ দেয়া হয়েছে। সবগুলোর কথা না বলে পারস্য উপসাগরীয় একটা অঞ্চলের কথাই শুধু নিয়ে আসছি। এ অঞ্চলে নতুন তিনটি রাষ্ট্রের নাম দেখা যাচ্ছে ঐ মানচিত্রে। একটি হলো 'এরাব শিয়া স্টেট' আরেকটি হলো 'সুন্নি ইরাক' এবং তৃতীয়টি হলো 'ফ্রি কুর্দিস্তান'। এটা ইসলামের মূল কেন্দ্র অঞ্চলে বিভেদ বিতর্ক ও হানাহানি সৃষ্টিরই একটি মহাপরিকল্পনা। যা মুসলমানদের ঐক্য এবং ইসলামের রেনেসাঁর আন্দোলনকেই বাধাগ্রস্ত করবে। আগেই বলেছি এই দুই লক্ষ্য নিয়েই ষড়যন্ত্র দু'টি আঁটা হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রে ছিটেফোটা কিছু দৃশ্য মাঝেমধ্যেই চোখে পড়ে। ষড়যন্ত্রকারী মহলটি বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন নামে গালফ স্টেটগুলোর কোথাও কোথাও, সৌদিআরবের পূর্বাঞ্চলের নির্দিষ্ট কিছু স্থানে বিভেদ বিতর্ক সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উপরোক্ত দু'টি ষড়যন্ত্র সাধারণভাবে দৃশ্যমান নয়। দৃশ্যমান ষড়যন্ত্র হলো ২০০১ সালে টুইনটাওয়ার ধ্বংস এবং পেন্টাগনে আক্রমণকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া 'ওয়ার অন টেরর'। যার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণভাবে ইসলাম ও মুসলমান। গোটা দুনিয়াব্যাপি ইসলামের জিহাদকে সন্ত্রাসের উৎস এবং মুসলমানদের সন্ত্রাসী হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও টুইনটাওয়ার ধ্বংস ও পেন্টাগনে আক্রমন কারা করেছিল এবং কারা এর পিছনে ছিল তা বিচারের মাধ্যমে এখনও নির্মিত হয়নি। তবুও বলা যায় মুসলমান নামের যে গুটি কতক লোককে এর সাথে জড়িত থাকার দায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যে আলকায়দাকে তাদের সংগঠন হিসাবে দেখানো হচ্ছে তা

শতভাগ সত্য হিসাবে ধরে নিলেও ইসলাম ও মুসলমানদেরকে এর সঙ্গে জড়িত করা যায় না। আল-কায়দা ইসলামি দুনিয়ার পরিচিত সমর্থিত কোনও আন্দোলন নয়। তাদের লক্ষ্য কর্মসূচির ব্যাপারেও মুসলমানরা কোনও ভাবেই অবহিত ছিল না। লাদেনও ইসলামি আন্দোলনের পরিচিত এবং পরিক্ষিতও কোনও নেতা ছিলেন না। টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার পর পশ্চিমী মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলমানরা যেমন আল-কায়দার নাম শুনে, তেমনি লাদেনেরও নাম জানতে পারে। সুতরাং তাদের কথিত কাজের সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্রাকেটেড করার কোনই সুযোগ নেই। কিন্তু তা করা হচ্ছে। ইসলামের দাওয়া আন্দোলনের নিষ্ঠাবান কর্মীদেরকে এবং ইসলামি নামের সাহায্য সংস্থাগুলোকে সন্দেহ করা হয়। এমনকি ব্যক্তি পর্যায়ে দানশীল ইসলামি ব্যক্তিদেরকেও সন্দেহের তালিকায় ফেলা হয়েছে। এছাড়া মুসলিম নামের এবং ইসলামিক প্রতীক সংবলিত টুরিস্ট, ব্যবসায়িক, কুটনীতিক, রাজনীতিক এবং সাধারণ সফরকারীদেরকেও পর্যন্ত নানভাবে নাজেহাল করতে দেখা যায়। পশ্চিমের অনেক দেশে মুসলিম নামের নাগরিকরাও তাদের চাকরি ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয়। 'ওয়ার অন টেরর' কার্যত ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সন্দেহ নেই বিশ্বব্যাপী ইসলামি রেঁনেসাকে আটকানো এবং পিছিয়ে দেবারই একটা কৌশল এটা।

এই ধরণের প্রবল বাধা এবং নানা সংকটের শিকার ওআইসির মুসলিম রাষ্ট্রগুলো আজ হিজরি পঞ্চদশ শতককে 'ইসলামের শতক' এ পরিণত করা দূরে থাক এ বিষয়ে কোনও উচ্চারণও তাদের মুখে নেই। বরং ঘর সামলাতেই মুসলিম দেশগুলো এখন মহাব্যস্ত।

এই পরিস্থিতিতেও দু'টি আশার আলো বিশ্বের মুসলমানদের সামনে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। তার একটি হলো, সচেতন হয়ে উঠা মুসলিম জনতা জাতি রাষ্ট্রভিত্তিক ইসলামি আন্দোলনকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। তুরস্কের ইতিবাচক রাজনৈতিক পরিবর্তন, মিসরের নির্বাচনে ইসলামি রেনেসাঁর ধারকদের সরকার গঠনের চমক যদিও টিকতে দেয়া হয়নি। লিবিয়ায় নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন সত্ত্বেও ইসলামি আন্দোলন নির্বাচনে ভাল করা ইত্যাদিসহ ইসলামি রেনেসাঁর পক্ষে সর্বত্র জনমতের ইতিবাচক উত্থান জাতি-রাষ্ট্র পর্যায়ে ইসলামি আন্দোলনের সাফল্যের এক নতুন অধ্যায়, এক নতুন সুবহে সাদেকের সূচনা করছে।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্বিতীয় আশার আলো হিসাবে সৌদি আরব ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অপপ্রচারের মোকাবেলায় ইসলামের পরিচয় ও ইসলামের দাওয়াত বিশ্বের সকলের কাছে পৌঁছাবার লক্ষ্যে 'আন্ত-ধর্ম সংলাপ' এর উদ্যোগ গ্রহণ করে।

আন্তধর্ম ডায়ালগকে সামনে রেখে বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজ ২০০৮ সালের ৪, ৫ ও ৬ জুন তারিখে মক্কায় ডায়ালগের গুরুত্ব বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সম্মেলনটিতে উপস্থিত থাকার আমার সুযোগ হয়েছিল। মক্কা সম্মেলনের ৩৯ দিন পর স্পেনের মাদ্রিদে ১৬, ১৭ ও ১৮ জুলাই

তারিখে আন্তধর্ম ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেও সাংবাদিক হিসাবে উপস্থিত থাকার সুযোগ এই লেখকের হয়েছিল। গোটা দুনিয়া থেকে সব ধর্মের প্রতিনিধি এসেছিলেন এই সম্মেলনে। পরিচিত প্রায় সকল ধর্মের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব সম্মেলনে ছিল। কোনও কোনও ধর্ম বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। দেখা গেছে, উল্লেখযোগ্য গ্রুপগুলোকেও সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। খৃস্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা দুনিয়াতে এখন সবচেয়ে বেশি। তারা বিভক্ত বহু গ্রুপে। সম্মেলনে মনে হয়েছে তাদের সবারই উপস্থিতি ছিল। সৌদি আরবের বাদশা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজের চেষ্টায় মাদ্রিদ সম্মেলন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদকে একটি আন্তধর্ম সংলাপ বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করে। এবং মাদ্রিদ সম্মেলন বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজকে অনুরোধ করে যে তিনি যেন তার প্রভাব কাজে লাগিয়ে জাতিসংঘের মাধ্যমে আন্তধর্ম ডায়ালগ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এই উদ্যোগ বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজ আন্তরিকভাবেই নিয়েছিলেন। তারই ফল হিসেবে ২০০৮ সালের ১৩ এবং ১৪ নবেম্বর তারিখে আন্তধর্ম ডায়ালগের ওপর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ১৪ জন বিশ্ব নেতাসহ জাতিসংঘের ৮০টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। সম্মেলনের সবাই তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ব্রুকমান। তিনি তার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, ধর্মের ইতিবাচক শিক্ষা আজকের পৃথিবীর জন্য সাংঘাতিকভাবে প্রয়োজন। প্রত্যেক ধর্মই সবাইকে সামাজিক দায়িত্বশীলতা শিক্ষা দেয়। অন্যদিকে ব্যক্তিবাদ ও স্বার্থপরতা আমাদের বিশ্বকে দূষিত করে ফেলেছে। আজ বিশ্বকে তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়সহ সব ক্ষেত্রেই একদিকে ভোগবাদ ও লোভের মূল্যবোধ, অন্যদিকে সামাজিক দায়িত্বশীলতা ও নৈতিক আচরণের মূল্যবোধ এ দু'য়ের যেকোন একটিকে বেছে নিতে হবে। তিনি আধিপত্যকারী পশ্চিমী সংস্কৃতির সীমাহীন লোভকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেন, যা উপস্থিত বিশ্ব নেতৃবৃন্দের অন্তর স্পর্শ করে। আন্ত-ধর্ম ডায়লগের উদ্যোগক্তা হিসাবে সৌদি আরবের বাদশাহ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজ জাতিসংঘের আন্ত-ধর্ম সম্মেলনে বলেন,

"সময় এসেছে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং গোড়ামী থেকে উদ্ভূত অযৌক্তিক রক্তপাত ও ধ্বংস থেকে শিক্ষা নেবার এবং আজ সময় এসেছে শান্তি পূর্ণ ও আরও সহনশীল বিশ্ব গড়ার জন্যে একটা সাধারণ মূল্যবোধ ঘিরে আমাদের একত্রিত হবার। আসুন আমরা একবাক্যে বলি, যে ধর্মের মাধ্যমে রাব্বুল আলামিন আল্লাহ মানবতার জন্য শান্তির প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন, সেই ধর্মকেই আমরা যেন মানুষের দুঃখ-কষ্টের নিমিত্ত করে না তুলি। পৃথিবী নামক এ গ্রহে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পরস্পরের সমান অংশীদার হিসেবে। তারা যদি মিলেমিশে শান্তি ও সমঝোতার মধ্যে বাস করতে না চায় তাহলে ভুল বুঝাবুঝির, বিদ্বেষ এবং ঘৃণার আগুন তাদেরকে শেষ করে দেবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারীদের মধ্যকার পার্থক্যের বিষয়কে উস্কে দেয়ায়

গোঁড়ামীর জন্ম হয়েছে। এই কারণে রক্তপাত এবং ধ্বংসকারি অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। যা সুস্থ বিবেকবোধ ও যুক্তির বিচারে একেবারেই অবাঞ্ছিত। এই অতীত থেকে আমাদের কঠিন শিক্ষা নিতে হবে এবং আমাদেরকে একত্রিত হতে হবে নৈতিক ও আদর্শিক সেই শিক্ষার ওপর যা আমরা বিশ্বাস করি। যেসব বিষয়ে আমরা মতভেদ করি আসুন সেসব বিষয়কে আমরা শেষ বিচার দিবসের জন্য আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিই। সুবিচারের দাবিকে অস্বীকার করা বিশ্বব্যাপী মানুষের দুঃখের একটি কারণ।...... সন্ত্রাস এবং অপরাধ মানসিকতা আল্লাহর শত্রু এবং শত্রু তারা সব ধর্ম এবং সভ্যতারও। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে পরিবার ব্যবস্থাকে দৃঢ় শক্তিশালী দেখতে চান, সে ব্যবস্থার বিপর্যয় মাদক ও অপরাধ প্রবণতার ভয়াবহ বিস্তারের কারণ।......... আমরা যদি সংলাপকে যৌক্তিকভাবে পরিচালন করতে পারি তাহলে এই সংলাপ বিশ্বের মানুষ ও জাতিসমূহের মধ্যে মহৎ মূল্যবোধের উজ্জীবন এবং একে সুসংহত করতে পারবে অবশ্যই। আর এটা হবে মন্দের ওপর মানব প্রচেষ্টার একটা বড় বিজয়। যা ভবিষ্যতে ভয়, দারিদ্রদ্র্য, অনুযোগ-অভিযোগের ওপর সুবিচার সুরক্ষা ও মহৎ জীবনের বিজয়ের ভবিষ্যৎ 'হক'কে উন্মুক্ত করবে। বাদশা আবদুল্লাহ তার 'Keynote' ভাষণের উপসংহারে আল-কুরআনের এ আয়াত উদ্ধৃত করেন 'হে মানুষ আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ একজন মহিলার একজোড়া থেকে এবং তোমাদের মধ্যে জাতি গোত্র সৃষ্ট করেছি যাতে করে তোমরা একে অপরকে জানতে পারো (এটা নয় যে তোমরা একে অপরকে ঘৃণা করবে)। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই সবচেয়ে বেশি প্রিয় যে সবচেয়ে বেশি সৎ কর্মপরায়ণ"।

আজ দুনিয়া জুড়ে অন্যায়, অনাচার ও অনৈতিকতার যে সয়লাব এবং ওয়ার অন টেররের নামে ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের ওপর যে হামলা চলছে তার প্রেক্ষাপটে মাদ্রিদ ও জাতিসংঘে আন্তঃধর্ম সংস্কৃতি সংলাপের আলোচ্যসূচিকে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে অভিহিত করা যায়। একমাত্র ধর্মভিত্তিক নৈতিকতা বিশেষ করে সর্বকনিষ্ঠ ধর্ম ইসলামের যে মানবিক দৃষ্টিকোণ তার মাধ্যমেই আজ দুনিয়াতে শান্তি সহযোগিতার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আন্তঃধর্ম ও আন্তঃসভ্যতা সংলাপের মাধ্যমে ধর্ম ও জাতি সমূহকে একে অপরের সহযোগী ও শান্তিকামী করে তোলার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

এর আগে ২০০৮ সালের ৪ জুন থেকে মক্কা মুকাররমায় অনুষ্ঠিত তিন দিনের বিশ্ব ইসলামি সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তৃতায় একটি অংশে বাদশা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজ বলেন, "অন্যান্য জাতির কাছে ইসলাম ও ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ডায়ালগ একটি শক্তিশালী মাধ্যম।......এই সম্মেলনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো, সম্মেলনটি পবিত্র কাবার ছায়ায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা মুসলমানদেরকে বিশ্বের সব মানুষের প্রতি তাদের বিরাট দায়িত্বের কথা স্মরণ করে দিচ্ছে। সম্মেলনে অন্যান্য জাতির সাথে সংলাপের কৌশল-পদ্ধতি নির্ধারনের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালনের পথ সৃষ্টি হবে।......... সহযোগিতা, সহাবস্থান, সুবিচার এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে

ইসলামের নীতি-অবস্থান সম্পর্কে পৃথিবীকে অবহিত করতে হবে। মুসলিম স্কলারস ও বুদ্ধিজীবীদেরকে পৃথিবীর জাতিসমূহ ও মানুষের সাথে সংলাপ ও তথ্য-বিনিময় অব্যাহত রাখতে হবে"।

এই ডায়ালগের ওপর দুনিয়ার বহু বিখ্যাতজনরা বক্তব্য দিয়ে এই উদ্যোগকে উৎসাহিত করেন। মক্কা মুকাররমা সম্মেলনে উপস্থিত ইরানের সাবেক প্রেসিডিন্ট রাফসানজানি উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। তিনি এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলন আয়োজনের জন্যে সৌদি সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "মুসলিম উম্মার বিভিন্ন সেকশনের মধ্যে সংলাপ আজ প্রথম প্রয়োজন। এ ধরণের সংলাপ অব্যাহত রাখতে হবে এবং এটা মুসলিম বিশ্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্ম সংলাপ সম্মেলনে বাদশা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষণ দেন। তিনি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে তার বক্তৃতা শুরু করেন। আয়াতটি হলো, "হে মানব মন্ডলী আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক জোড়া নারী পুরুষ থেকে এবং তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হয়। শুন, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই বেশি সম্মানিত বা প্রিয় যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ন্যায় পরায়ণ"। আয়াতটি তেলায়াতের পর তিনি বলেন, শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের রসূল মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহী ওয়া সাল্লাম এর ওপর'। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, "দুই পবিত্র মসজিদের দেশ এবং প্রতিটি মুসলমানের প্রিয়তম জায়গা থেকে সদ্য সমাপ্ত মক্কা সম্মেলনের স্কলারস ও থিঙ্কারসসহ ইসলামি বিশ্বের পক্ষ থেকে মেসেজ নিয়ে এসেছি আমি। এই মেসেজের ঘোষণা এই যে, ইসলাম সহনশীলতা ও মধ্যম পন্থার ধর্ম। এই মেসেজ সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে গঠনমূলক সংলাপের আহবান জানায় এবং আল্লাহ চাহে সংঘাতের বদলে সংঘতির এক নতুন পৃষ্ঠার উন্মোচন এই মেসেজের প্রতিশ্রুতি।....... আমরা এক আল্লাহর বিশ্বাসী। তিনি মানবতার ইহজাগতিক ও পরজাগতিক কল্যানের জন্যে নবী রাসূলদের পাঠিয়েছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ'র। মানুষ বিভিন্ন বিশ্বাস ও জাতিতে বিভক্ত থাকবে, এটা আল্লাহর ইচ্ছার বাহিরে নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি অন্য রকম চাইতেন, তাহলে গোটা মানব জাতি একই ধর্মের অন্তর্ভূক্ত হতে পারতো। আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি এটাই নিশ্চিত করতে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের জন্যে যে সুখ চেয়েছেন তা ধর্মই এনে দিতে পারে। সুতরাং মানুষের সুখ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ধর্মই নিশ্চিত মাধ্যম হওয়া উচিত। সুতরাং এটা আমাদের দায়িত্ব এ কথা বিশ্ববাসীর সামনে ঘোষণা করা যে, মতদ্বৈততা যেন সংঘাত সংঘর্ষের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে না যায়, এ কথা বিশ্বকে বলা যে, মানব ইতিহাসে যে সব বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটেছে, তার জন্যে ধর্মের ওপর দোষ চাপানো ঠিক নয়। এর জন্য দায়ী চরম পন্থা, যা প্রতিটি ঈশ্বরীক ধর্ম ও প্রতিটি রাজনৈতিক মতবাদের কিছু অনুসারীর ওপর বর্তায়.........মানবতা আজ মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আদর্শিক বিভ্রান্তিতে ভুগছে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সতেও মানুষ সংকট জনক পর্যায় আজ অতিক্রম

করছে। মানুষ আজ দেখছে অপরাধের মারাত্মক বিস্তৃতি, সন্ত্রাসের বিস্তার, পরিবার ব্যবস্থার খন্ড-বিখন্ড দশা, মাদক জনিত কারণে যুব মনের বিকৃতি এবং সবলের দ্বারা দুর্বলের শোষণ ও অবাঞ্ছিত বর্ণবাদ প্রবণতা। এ সবই মানুষের আধ্যাত্মিক বিচ্যুতির ফল। এই বিচ্যুতি ঘটে যখন মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। আর মানুষ আল্লাহকে ভুলে গেলে মানুষ নিজেদেরকেও ভুলে যেতে বাধ্য হয়। সংলাপের মাধ্যমে ধর্ম ও সভ্যতা সমূহের মধ্যে একটা ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ ছাড়া মানবতার এই সংকটের কোনও সমাধান নেই।........ আগের অধিকাংশ সংলাপ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অস্থিরতা অবসানের বদলে বিতর্ক বাড়ানো এবং বিভেদ উস্কে দেয়া অর্থহীন পদক্ষেপ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অথবা অনেক ক্ষেত্রে তা ধর্মগুলোকে ঘনিষ্ট করতে গিয়ে ধর্ম ও আদর্শের বিরোধটাকেই মুখ্য করে তুলেছে। এ ধরনের প্রচেষ্টা আসলেই অর্থহীন। কারণ প্রত্যেক অনুসারী তার ধর্মকে সত্য বলে মনে করে এবং বিকল্প কিছু গ্রহণ করতে সাধারণভাবে রাজি হয় না। আমরা যদি এই ঐতিহাসিক সম্মেলনকে সফল করতে চাই, তাহলে স্রষ্টার ওপর গভীর বিশ্বাস, মহৎ নীতি-নিয়ম এবং নৈতিক মূল্যবোধের মতো সব ধর্মের মূল বিষয়গুলোর ওপর জোর দিতে হবে, যা আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। এই গ্রহ এবং এই গ্রহের সবকিছু ধ্বংসের নিমিত্ব মানুষ হতে পারে, আবার মানুষই এই পৃথিবীকে শান্তি ও স্বস্থির মরুদানে পরিণত করতে পারে, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, আদর্শ ও দর্শনের অনুসারীরা সহাবস্থান করতে পারবে, যেখানে মানুষ একে অপরকে সম্মান করবে এবং সন্ত্রাসের বদলে সংলাপের মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে। আল্লাহর দয়ায় মানুষ আরও সক্ষম ভালবাসার দ্বারা ঘৃণার এবং সহনশীলতার মাধ্যমে গোড়ামীর অবসান ঘটাবে, যা মানুষকে সেই মর্যাদায় সমাসীন করবে যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের দান করেছেন। আসুন আমরা চাই আমাদের সংলাপ অবিশ্বাসের ওপর বিশ্বাসকে, পাপের ওপর পূণ্যকে, বৈষম্যের ওপর সুবিচারকে, যুদ্ধ ও সংঘাতের ওপর শান্তিকে এবং বর্ণবাদের ওপর ভ্রাতৃত্বকে বিজয়ী করতে সফল হোক। আমি আল্লাহর নামে কথা শুরু করেছিলাম, তারই কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যমে আমি কথা শেষ করছি। আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক অভিন্দন"।

মক্কা মুকাররমা, মাদ্রিদ ও জাতিসংঘ সম্মেলনে বাদশাহর ভাষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর জাতিসংঘে বাদশাহ আবদুল্লাহর ভাষণ ছিল ঐতিহাসিক। গত ৫১ বছরের মধ্যে প্রথম একজন সৌদি বাদশাহ জাতিসংঘ সম্মেলনে দাঁড়িয়ে ইসলাম ও বিশ্বশান্তির পক্ষে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে একটি গুরুৎপূর্ণ keynote ভাষণ দিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তার ভাষণের প্রতি সবারই বিশেষ করে পাশ্চাত্যের মানুষদের একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। 'গোঁড়া ইসলামি দেশ' হিসেবে পাশ্চাত্যের কাছে পরিচিত ইসলামের কেন্দ্রভূমি সৌদি আরবের শাসক ইসলাম, সংলাপ, আন্তধর্ম সহযোগিতা বিষয়ে কি বলেন তা পাশ্চাত্যের ঔৎসুক্যের বিষয় ছিল। এই দিক দিয়ে বাদশাহ আবদুল্লাহর ভাষণ ছিল খুবই যৌক্তিক ও উৎসাহব্যঞ্জক। বাদশাহর বক্তব্য আমাদের সমসাময়িক পৃথিবীর জন্যে ইসলামের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট মেসেজ আছে। বাদশাহ আবদুল্লাহ সম্মেলনে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর

পক্ষ থেকেই নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন। সুতরাং তার কথাগুলো সত্যিই এক ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে। মক্কা, মাদ্রিদ ও জাতিসংঘ সম্মেলনে তার বক্তব্যের কয়েকটি দিক ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা-পীড়িত আজকের বিশ্বের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমনঃ

ক) শুরুতেই সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্মের তিন শতাধিক নেতার সামনে এবং বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফের যে আয়াতে কারিমা তিনি পাঠ করেছেন, তা প্রমাণ করে কুরআন এবং মুসলমানরা অন্যান্য ধর্ম ও জাতির অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নয়, তাই সহাবস্থানেরও বিরোধী নয়।

খ) দুনিয়া জুড়ে আজ প্রপাগান্ডা চালানো হচ্ছে, ধর্মই যুদ্ধ-সংঘাতের উৎস। যুদ্ধ-সংঘাত সব ধর্মের কারণেই সংঘটিত হয়েছে। বাদশাহ এই অপপ্রচার প্রত্যাখ্যান করে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, যুদ্ধ- সংঘাতের দায় ধর্মের উপর চাপানো যায় না। বিভিন্ন ধর্মসহ দুনিয়ার ধর্মহীন বা ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের চরমপন্থী কিছু লোকের কারণেই যুদ্ধ-সংঘাত সংঘটিত হয়েছে।

গ) দুনিয়ার মানুষ আজ বিভিন্ন অপরাধের বিস্তারসহ পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত। মানুষ আজ তার মানবিক মর্যাদা ভুলে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের আত্মহনন করছে। বাদশাহ আবদুল্লাহ মানুষের এই অবস্থাকে স্রষ্টাকে ভুলে যাবার ফল বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, স্রষ্টাকে ভুলে গেলে মানুষ নিজের পরিচয়-মর্যাদাকেও ভুলে যায় এবং তারই ফলে সে সীমাহীন সব অপরাধ ও সংকটে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

ঘ) সংলাপ ব্যাপারে বাদশাহ আবদুল্লাহ সহমর্মিতাও সহয়োগিতার পথ হিসেবে একটা মৌলিক বিষয়ের দিকে সকলকে আহবান করেন। তিনি বলেন, অতীতে ব্যর্থতা এড়াতে হলে প্রথমেই বিরোধ নিরসনের আলোচনায় না গিয়ে বিভিন্ন ধর্মের ঐকমত্যের দিক যেমন, স্রষ্টায় গভীর বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতার প্রতি নিষ্ঠা এবং আদর্শিক মূল্যবোধ ইত্যাদির প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।

সব ধর্মের লোকদের সামনে, বিশ্ব নেতৃবৃন্দসহ বিশ্বের আশিটি দেশের প্রতিনিধির সামনে এবং পাশ্চাত্যের প্রেস ও মানুষের সামনে ইসলামের দৃষ্টিকোণ তুলে ধরতে পারাই বিরাট সাফল্য। আজ ইসলাম ও মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের অজ্ঞতা। এ অজ্ঞদের সামনে বাদশাহসহ মুসলিম দেশের বক্তব্য পেশ করতে পারাটা অবশ্যই বিরাট কাজ। ইসরাইলসহ গুটিকয়েক দেশ ছাড়া সবাই সম্মেলনের উদ্যোক্তা বাদশাহ আবদুল্লাহর বক্তব্যের প্রশংসা করেছেন। এই প্রশংসা ইসলামের পক্ষেই আসছে।

থার্ড মিলেনিয়ামের প্রথম শতকের প্রথম বছর থেকেই পাশ্চাত্য ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'ওয়ার অন টেরর' নামের যে সন্ত্রাস এবং তার পাশাপাশি যে প্রপাগান্ডা যুদ্ধ ছুড়ে দিয়েছে, পাশ্চাত্য এবং পৃথিবীর মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করাই তাদের ছুড়ে দেয়া এই যুদ্ধ মোকাবিলার কৌশল হওয়া উচিত। আন্তঃধর্ম ও আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপ

আয়োজনে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সৌদি আরবের বাদশাহ আবদুল্লাহ যুদ্ধ জয়ের এই কৌশল নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিলেন। ইসলামি দুনিয়ার সংকটের মুহূর্তে পাশ্চাত্যের সাথে আমাদের অসম যুদ্ধে তিনি সামনে এগুবার পথ হিসেবে ডায়ালগ ও দাওয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক অস্ত্র তুলে নিয়েছেন, কৌশলগত দিক থেকে এর কোনও বিকল্প নেই।

সংলাপে আমাদের শুধু লাভই, কোনও ক্ষতি নেই। ইসলাম সর্বকনিষ্ঠ জীবন্ত ও ঐতিহাসিক ধর্মই শুধু নয়, ইসলাম মানুষের গোটা জীবন, পৃথিবীর সমাজ-সভ্যতা নিয়ে কথা বলে। সুতরাং মানুষ এবং মানুষের পৃথিবীর জীবন ও ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখার ক্ষমতা শুধু ইসলামেরই আছে। পাশ্চাত্যের সমাজ-বিজ্ঞানীরা এই কথা একটু অন্যভাবে স্বীকারও করেন। Godfrey Gansen তার "International Islam' প্রবন্ধে প্রায় তিন দশক আগে স্বীকারও করেছেন (Economist, 03-01-1981),

"আজ ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করছে। আর কোনও ধর্মেরই পাশ্চাত্যকে চ্যালেঞ্জ করার এই ক্ষমতা নেই। খৃস্ট ধর্মের এ ক্ষমতা নেই, কারণ খৃস্ট ধর্ম পশ্চিমী সভ্যতার একটা অংশ এবং আধুনিকতা একে ভেতর থেকেই খেয়ে শেষ করেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মও প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, কারণ এরা পাশ্চাত্য প্রভাবিত এবং অতি-প্রাকৃতিক কল্পকথায় ভাসমান। আর জুদাইজম (ইহুদিবাদ) তো ক্ষুদ্র ও গোত্রীয় একটা ধর্ম"।

সুতরাং যে কোনও সংলাপ বা ডায়ালগে অবদান রাখার মতো ইসলামের অনেক কিছু আছে। এই অবস্থায় পৃথিবীতে যদি শান্তি বজায় থাকে, সম্প্রীতি ও সমঝোতার মাধ্যমে সব ধর্মই যদি তাদের ইতিবাচক কাজ করতে পারে এবং সব ধর্মের পরিচয় যদি সব মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে, তাহলে ইসলামকেই দুনিয়ার মানুষ তাদের অনুসরণীয় ধর্ম হিসেবে বেছে নেবে। অতএব, দুনিয়ার মানুষের মধ্যে, জাতিতে জাতিতে, দেশে-দেশে শান্তি, সম্প্রীতি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা ইসলামের স্বার্থেই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এই কর্মপন্থা বা কৌশল ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলনেরই আর এক রূপ, যা বোধ হয় একুশ শতকের জন্যেই খুব বেশি প্রয়োজন। আল হামদুলিল্লাহ, ইসলামি রেনেসাঁ, ইসলামি দাওয়া এর এই নতুন আন্দোলনের পতাকা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হারামাইন শরিফাইন বুকে ধারণকারী সৌদি আরবই উড্ডীন করেছিল, যেমন বিশ শতকের ইসলামি রেনেসাঁ আন্দোলনের পাওয়ার ছিল তারাই।

বলা যায়, পতন ও পরাধীনতার দীর্ঘ রাতের পর, জাতি পর্যায়ে বিভিন্ন নির্যাতন নিপীড়ণ ও পর্বত প্রমাণ বাধা ডিঙ্গানোর পর, টুইন টাওয়ার ধ্বংস-উত্তোর ওয়ার অন টেররের বিপদ বিপর্যয় মোকাবেলার প্রান্তে এসে একদিকে জাতি রাষ্ট্র পর্যায়ে ইসলামি রেনেসাঁর উত্থান যেমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠছে, তেমনি অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংযোগ, ডায়ালোগ, ইসলামকে জানার সর্বব্যাপি এক কৌতুহল জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে ইসলামি রেনেসাঁ দুনিয়ার অপরিচিত জনপদে, অপরিচিত মানুষের মধ্যে, অপরিচিত ভূ-খন্ড সমূহে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ■

ইসলামী আইনের অন্যতম উৎস আস্‌সুন্নাহ

প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম

(শেষাংশ)

৭. রাসূল (সা:) কে বিচারক মানা এবং তার দেয়া রায় মানা বাধ্যতামূলক

সুন্নাতে রাসূলের কাজ যেমন ধর্মীয় রীতি নীতি শিক্ষাদান করা অনুরূপভাবে বিচার কার্য পরিচালনাসহ দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা সহ সকল পার্থিব এবং আধ্যাত্মিকতা শিক্ষাদানও তাঁর নবুওয়াত এবং রেসালাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তার দেয়া বিচারিক রায় মেনে নেয়া, না নেয়ার মধ্যে ইমানদার থাকা না থাকার সম্পর্ক নির্ভরশীল। এ বিষয়ে কোরআনের ভাষ্য হচ্ছে-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

"অএতব, না কক্‌খনো নয়, তোমার পালনকর্তার শপথ এ সব লোক ইমানদার হতে পারবেনা, যতক্ষন না তাদের যাবতীয় কর্মে তারা তোমাকে (মুহাম্মদকে) বিচারক হিসেবে না মানবে। অতপর তোমার দেয়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাদের কোন সংকীর্ণতা না থাকবে এবং তোমার দেয়া সিদ্ধান্ত সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে না নেবে।[১]

উল্লেখ্য না মানাতো নয়ই বরং রাসূলের দেয়া বিচারিক রায়ের ব্যাপারে ইমানদার এর মনে মানা-নামানার অপশন থাকারও সুযোগ নেই। যেমন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا

"আল্লাহ এবং আল্লার রাসূল কোনো বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দিলে সে বিষয়ে কোনো ঈমানদার নারী পুরুষের এ ব্যাপারে ভিন্নমত থাকার সুযোগ নেই আর তা অমান্য করলে তা হবে প্রকাশ্য অবাধ্যকতার শামীল।[২]

সুন্নাতে রাসূলের পক্ষে এর চেয়ে শক্তিশালী দলিলীক অনুমোদন আর কি হতে পারে!

৮. যাবতীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের নিকট পেশ করতে হবে

জীবন পরিচালনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধ বা মত বিরোধ থাকাটা প্রাকৃতির

---

১. আল কোরআন, আল নিসা ০৪:৬৫। হাফেজ আবু ইসহাক তার তাকসিতে উল্লেখ করেন যে, রাসূল আল্লার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাদী, বিবাদী প্রথমে আবু বকর এর নিকট, পরে উমার (রা) এর নিকট এসে পরাজিত পক্ষ আপত্তি দায়ের করে। ওমার অভিযোগকারীকে হত্যা করেন তার নিজ তলোয়ার দিয়ে। ওমারের এ এ্যাকশননেক উপরোক্ত আয়াতে বৈধতা দান করো হয়। অভিযোগ কারীর নাম ছিল বিশার বিন আবহার। সম্ভবত: বিদ্যার মানদণ্ডে এ হত্যাকে বৈধতা দেয়া হয়।

২. আল কোরআন, আল আহযাব, ৩৩:৩৬; আন নূর, ২৪:৬৩

নিয়মেরই অংশ আর এর সাথে যোগ হয় মানবসৃষ্ট মত বিরোধ। এ বিরোধের পরিধি অসীম। সমকালীন জন্মনিরোধ ও জন্ম দান পদ্ধতি নিয়ে বিরোধ, বিয়ে শাদীর বিষয়ে বিরোধ, মোহর (Marital gift) নিয়ে বিরোধ, সম্পত্তি প্রাপ্তীর পরিমাণ এবং মান নিয়ে বিরোধ, সন্তান সন্ততি এবং পিতা মাতার লালন-পালন বা ভরণ পোষণ নিয়ে বিরোধ, সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ নিয়ে বিরোধ, টেস্ট টিউব (Test tube) বেবীর জন্ম নিয়ে বিরোধ, রক্ত দান, চক্ষু দান, নিয়ে বিরোধ, ব্যাংকের লেনদেনে সুদ ও মুনাফা নিয়ে বিরোধ, নারীর রাষ্ট্র পরিচালনা নিয়ে বিরোধ, সীমান্ত রক্ষা, যুদ্ধ, সন্ধি নিয়ে বিরোধ, পানি সীমানা নিয়ে বিরোধ, নারীদের ইমামতি করা নিয়ে বিরোধ, সুন্নাত-বেদ'আত নিয়ে বিরোধ, নামাজের নিয়ম নীতি নিয়ে বিরোধ আরও কত কি? এসব সমস্যা বা বিরোধের সমাধানের আরজী পেশ করতে হবে আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে অর্থ্যাৎ আল কোরআন ও আস সুন্নাহ কাছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ঘোষণা হচ্ছে-

فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"অতপর তোমাদের মাঝে যদি কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা (সমাধানের জন্য) আল্লাহ ও রাসূলের নিকট পেশ কর যদি সত্যিই তোমরা ইমানদার হও এবং পরকালে বিশ্বাস কর আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে উত্তম।[৩]

৯. আল্লার ভালবাসা প্রাপ্তির শর্ত হলো সুন্নাতে রাসূলের অনুগত হওয়া

আল্লার ভালবাসা অর্থ হচ্ছে আল্লার সন্তুষ্টি (Pleasur of Allah) অর্জন। এর অর্থ এও হতে পারে যে, প্রকৃত মুসলিম হওয়া আর এর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অনুসরণ করতে হবে। রাসূলের অনুসরণ বা আনুগত্যের অর্থ হলো সুন্নাতে রাসূল এর অনুসরণ। এ প্রসঙ্গে আল্লার নির্দেশিকা হচ্ছে,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"হে নবী বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তাহলে আমার (মুহাম্মদ সা:) আনুগত্য কর। তা হলে তিনি তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং (চিরস্থায়ী) জান্নাত দেবেন।[৪]

অতএব, নিজ স্বার্থেই আল্লাহ প্রেম, অপরাধ মর্যনা এবং জান্নাত প্রাপ্তির স্বার্থেই সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ এবং এর চিরস্থায়িত্ব চাওয়া এবং হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে সুন্নার নিছক অনুসরণই যথেষ্ট নয় বরং এর পুন:জীবনও মুসলিম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

সুন্নাতে রাসূলের স্বীকৃতি, মর্যাদা, নির্ভরশীলতা এবং চিরস্থায়িত্ব প্রসঙ্গে সুন্নাতে রাসূল

এ যাবত আল কোরআনের আলোকে সুন্নাতে রাসূলের মর্যাদা (Status) আলোচনা

---

৩. আল কোরআন, আল নিসা, ৪:৫৯
৪. আল কোরআন, আল ইমরান, ৩:৩১

করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূল সম্পর্কে রাসূল (সা) কি বলেছেন, এর কয়েকটি দিক অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। রাসূল (সা) মুয়ায বিন জাবাল (রা.) কে ইয়ামানের গভর্নর হিসেবে পাঠানোর পূর্বে তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

"হে মুয়ায তোমার আদালতে কোন মামলা আসলে তার বিচার তুমি কিভাবে করবে? তিনি বললেন, আমি আল্লার কোরআন দ্বারা এর রায় দেব। কোরআনে যদি এর সমাধান না পাও? রাসূল আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন। মুয়ায (রা) বললেন, তখন আমি আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহর দ্বারা এর সমাধান দেব। সুন্নাহ যদি না পাও? মুয়ায (রা) বললেন, তখন আমি আমার গবেষণা লব্ধ মতামত দ্বারা এর সমাধান দেব। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জবাবে সন্তুষ্ট হলেন এবং মুয়াযের বুকে হাত চাপড়ায়ে (Patted his chest) তাকে ধন্যবাদ জানালেন।"[৫]

হাদিসে মুয়ায বিন জাবাল নামে প্রসিদ্ধ এ বর্ণিত বিষয়টি মূলতঃ আল কোরআনের পরেই যে সুন্নাতে রাসূলের স্থান, তারই স্বীকৃতি পাওয়া গেল একই সাথে ইজতিহাদের স্থান যে কোরআন এবং সুন্নার পর তাও প্রতিষ্ঠিত হলো।

রাসূল সাঃ এর প্রতি ভালবাসা দুনিয়ার সকল কিছুর ভালবাসার ওপর স্থান না দেয়া পর্যন্ত ইমানদারও হওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলের নিজস্ব বক্তব্য হলোঃ

"আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল আল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্য কেউ ইমানদার হতে পারবেনা, যতক্ষণ না আমি তার নিকট অধিকতর প্রিয় হই তার পিতা মাতা, তার সন্তানসমূহ এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে। "[৬]

রাসূলকে ভালবাসার অর্থ ব্যক্তি হিসেব তার প্রতি মহব্বত বা ভালবাসা। এ ভালবাসা এমন নিখুঁত হতে হবে যে ভালবাসার যোগফল একজন ব্যক্তির তার মাতা, পিতা, সন্তান এবং পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি তার সামগ্রীক ভালবাসার যোগফলের অধিক হতে হয়। আর এর দ্বিতীয় স্তর হলো- রাসূলের রেখে যাওয়া আদর্শকে সকল কিছুর উপর স্থান দেয়া। রাসূলকে ভালবাসলাম আর সুন্নাতে রাসূল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক রীতি-নীতি মানলামনা, সমাজ, রাষ্ট্র, বিচার ব্যবস্থা, সামরিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সংস্কৃতিক ব্যবস্থা মানলামনা বা গুরুত্ব দিলামনা, তাহলে কি রাসূলের প্রতি ভালবাসা আছে তা বলা যাবে? না বলা যাবেনা।

নিছক রাসূলের প্রতি, তার সুন্নার প্রতি ভালবাসাই যথেষ্ট নয় বরং রাসূলের সুন্নাতের বা তরিকার সংরক্ষণ এবং পুণঃজীবনেও ভূমিকার রাখার প্রতি তাকিদ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলের বক্তব্য হলোঃ

"কেউ ইসলামে যদি একটি উত্তম নজির স্থাপন করেন (সুন্নাতান হাসানাহ) তা হলে তিনি এর পুরস্কার পাবেন এবং পরবর্তীতে যারা এর অনুসরণ করবেন, কোন প্রকার কর্তন (Reduce) ছাড়াই তাদের সকলের সমপরিমাণ অর্জিত ছাওয়াবও সে ব্যক্তির আমল নামায় যুক্ত হবে (যতদিন সুন্নাটি চলমান থাকবে)। বিপরীত পক্ষে যে ব্যক্তি

---

৫. সুনান আবু দাউদ, তৃতীয় খন্ড, নং ৩৫৮৫

৬. সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, হাদিস নং ১৪, সহীহ মুসলিমেও এ হাদিসটি সংকলিত হয়।

ইসলামে কোন মন্দ নজির (সুন্নাতান সাইয়ে আতান) চালু করবে সে এর বোঝা বহন করবে এবং যারা তার এ নিকৃষ্ট সুন্নাটি অনুসরণ করবে কোন প্রকার হ্রাসকরণ ছাড়াই তাদের সকলের সম পরিমান পাপের বোঝা তার উপর ছাপিয়ে দেয়া হবে।"[৭]

বিপন্নকে দান করা সুন্নাতে রাসূলেরই অংশ বিশেষ। তদসংক্রান্ত হাদিসটির প্রেক্ষাপট হচ্ছে, একজন বিপন্ন মানুষের জন্য রাসূল (সা) সাহায্যের জন্য আবেদন করলেন, প্রথমে কেউ সাড়া দিলেন না, পরে একজন আনসারী কিছু সিলভার মুদ্রা নিয়ে তা দান করলেন। তার দেখাদেখী অনেকেই দান করলেন, দানের পরিমান অনেক বেড়ে গেল। তা দেখেই রাসূল (সা) বললেন, মান সান্না ফিল ইসলামে সুন্নাতান হাসানাহ। সুন্নাতে রাসূল আজ মৃতপ্রায়। ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার পরিচালনায় স্থান করে নিয়েছে সুন্নাহ বিরোধী সকল প্রথা, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, নারীনীতি, ব্যাংক বীমা নীতি, যুদ্ধনীতি, সন্ধিনীতি, বিচার নীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানব প্রসূত এবং মানব প্রদত্তনীতির সমাহার রাসূলের নীতিকে প্রায় বিলীন করে দিয়েছে। এ অবস্থায় সুন্নাতে হাসানার পুন:জীবন সময়ের দাবী। সুন্নাতে রাসূলের চিরস্থায়ীত্ব দানের জন্যই রাসূলের এ নির্দেশনা। এক্ষেত্রে বিদ'আত এর অনাকাংখীত দোহাই দিয়ে, সুন্নাতে রাসূরের উত্তম নতুন অবদানকে নিরুৎসাহীত করা হবে নিছক নির্বুদ্ধিতা।

সুন্নাহ দরদী সংগঠনের সুন্নাহ পরিপন্থী বিশ্বাস ও কর্ম

সুন্নাতে রাসূলের দাবী হচ্ছে কোরআনের আলোকে বিশ্বাস ও কর্মকে সাজানো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সামগ্রীক ভাবে ব্যাপক সংখ্যক আলেম-ওলামা বিশেষভাবে সুন্নাতের অনুসারী দাবীদার কিছু কিছু আহলে সুন্নাত ওয়া আল জামায়াত পন্থীদে মাঝে চরমভাবে সুন্নাতে রাসূল পরিপন্থী চিন্তা ও কর্মের প্রভাব ও প্রসার অনেক বেশী লক্ষ্যনীয় এবং প্রতিয়মান। তাদের মৌলিক কার্যসূচী যেন রাসূলের দৈহিক গঠন, গায়েব জানা-না জানা, রাসূল মিলাদ মাহফিলে স্বশরীরে উপস্থিত কিনা ইত্যাদি বিষয়ের চর্চা করা।

সুন্নাতি বা আহলে সুন্নাত আল জামায়াত মূলত ঘটিত হয় প্রথমত: শিয়া সম্প্রদায়কে মুসলিমদের থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য ৯৩৩ সালে।[৮] রাসূল মুহাম্মদ (সা:) নূরের তৈরী বলে দাবী করেন প্রথম আন্দুলুসিয়ান সুফি আবু বকর ইবনুল আরাবী (১০৭৬-১১৪৮)। তিনি দাবী করেন, সৃষ্টির পূর্বেই মুহাম্মদ বিদ্যামান ছিলেন (existed) আকাশে তারকা হিসেবে। ১০ম শতকের এ কাল্পনিক বক্তব্যকেই তরিকা এবং সুন্নীপন্থী দাবীদারগণ একে তাদের বিশ্বাসের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কোরআনের একটি আয়াতের মনগড়া অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে তারা নূর নবীর পক্ষে কোরআনকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। আয়াতটি হলো:

---

৭. সহীহ মুসলিম, কিতাব আল 'ইলম, হাদিস নং ৬ এবং নং ১০১৭)

৮. বলা হয়ে থাকে, ইমাম জাফর আল সাদেক কর্তৃক ১৮৮০ সালে আহলে সুন্নাতের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানের বাংলাদেশে অগনিত সংগঠন রয়েছে এ নামে। তবে আশার কথা হচ্ছে, সুন্নাতে রাসূলকে এর সঠিক পন্থায় নিয়ে আসার কাজও করছে কয়েকটি সংগঠন।

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَـٰبٌ مُّبِينٌ

"তোমাদের কাছে আল্লার পক্ষ থেকে একটি উজ্জল আলো (নূর) এসেছে এবং একটি সমুজ্জল গ্রন্থ।" (There has come to you from Allah a light and a clear Book"[9]

এ আয়াতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসছে এ নূরকে তথাকথিত তরিকাপন্থী এবং উগ্র সুন্নীরা এ নূরকে মুহাম্মদ (সা:) বলে বিশ্বাস করেন। অথচ এ নূর অর্থ ইসলাম। এটা যেমন আল্লার কথার অপব্যাখ্যা অনুরুপভাবে মুহাম্মদ (সা:) এর প্রতি অতিমাত্রায় অযাচিত ভালবাসার লক্ষণ ও প্রতিফলন। এ জাতীয় অতিরঞ্জন মূলত: নবুয়তকেই শুধু খাট করা নয় অস্বীকার করারও শামীল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমার প্রসংসা করতে গিয়ে তোমরা অতিরঞ্জিত করোনা, যেমনটা করা হয়েছিল 'ঈসা ইবন মারিয়াম এর ক্ষেত্রে বরং (আমাকে বলো) আল্লার বান্দা এবং তার রাসূল।"[১০] দুঃখজনক হলো নূর ওয়ালারা মনের অজান্তেই তাদের অনুসারীরা আল্লাহর বান্দা 'ঈসাকে একই সাথে আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহ (God) বানিয়ে ছেড়েছে।

আল কোরআনের অনেক স্থানে এ অপবাদের জবাব দেয়া। হয়েছে এর একটি হলো:

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ

"বলল! নিশ্চিতভাবে আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট এ ওয়াহী পাঠানো হয়েছে যে, তোমাদের প্রভূ হচ্ছে একজন এবং অদ্বিতীয় প্রভু।[১১]

রাসূল আল্লাহ আরো বলেছেন,

"মানুষ আদমের সন্তান আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে"[১২]

সংক্ষিপ্ত এ তথ্যের ভিত্তিতে দৃঢ়তার সাথে বলা যায়, রাসূলকে নূরের তৈরী বলা জলন্ত মিথ্যাচার এবং ইসলাম অস্বীকার করার নামান্তর। এতে আরও একটি নির্লজ্জ মিথ্যা সংযোজন হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ গায়েব অর্থাৎ মানবীয় দৃষ্টি অগোচরে যা আছ তা জানেন এবং তার নামে কোন মিলাদ বা মাহফিল করলে তিনি তা দেখেন এবং স্বশরীরের উপস্থিত হন। কোনো কোনো স্থানে একটি সুন্নাতি গ্রুপ মজলিশে তাঁর জন্য একটি খালি চেয়ারও পেতে রাখেন এ বিশ্বাসে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এখানে আসেন এবং বসেন, তাদের কাজকর্ম দেখেন এ শুনেন। অপবাদটি পূর্বেরটির চেয়ে আর জঘন্য, কারণ গায়েব জানার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। আল্লাহ বলেন,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ

"বলুন! আকাশ ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েবের খবর জানেনা"।[১৩] এবং

---

৯. আল কোরআন, আল মায়েদা, ৫:১৫
১০. সহীহ বোখারী, হাদিস নং ৬৮৩০ (কিতাব ৪৬, নং ৫৬) সহীহ মুসলিমেরও ৬৮৩০ নম্বেরে এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।
১১. আল কোরআন, আল কাহাফ , ১৮:১১০
১২. সুন্নান আল তিরমিজি, হাদিস নং ৩৯৫৫

وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ

"আমি (মুহাম্মদ সা:) তোমাদেরকে এ কথা বলিনা যে, আমার ভান্ডার (খাজনা) রয়েছে এবং এও বলিনা যে, আমি গায়েবের খবর জানি[১৪]

রাসূল (সা) বলেছেন,

قَالَ مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

"আমি যা বলিনি কেউ যদি আমার নামে এমনটি চালিয়ে দেয়, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।" (সহীহ আল বুখারী, অধ্যায় ইলম, হাদীস নং-১০৯)

প্রশ্ন হচ্ছে এতদসংক্রান্ত কোরআন সুন্নার সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরও ইসলাম জানার দাবীদার, সুন্নাতে রাসূলে প্রেমিক হওয়ার দাবীদারগণ কেন কোরআন সুন্নার শতভাগ বিপরীত মতবাদের ধারক-বাহক সেজেছেন এমনকি যারা তাদের মতের সাথে একমত নন তাদের মুসলিমও মনে করেননা তারা। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন ইসলাম বিনাশী চিন্তার উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবেই বা তা ইসলামের আলমদের মাঝে প্রবেশ করলো?

এর বিস্তারিত জবাব এখানে দেয়া সম্ভব নয়, তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, যারা আল্লাহর নবী ঈসা আ: কে আল্লাহর আসনে বসিয়েছে, যারা ইব্রাহীম আ., মুসা আ. কে নবী স্রষ্টা (God) প্রকাশিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করে, এটা তাদেরই কাজ যারা নবী মোহাম্মদ (সা:) কে আল্লার প্রতিবিম্ব (Replica) দেখানার অব্যাহতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাল (موضوع) হাদিস তৈরী করে তারা কৌশলে তা ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতিতে পৌঁছায়ে দিয়েছে। তরিকাপন্থী, সুদী বাদীরা এবং আহলে সুন্নাহ নামী অধিকাংশ সংগঠন ইসলামের শত্রুদের নির্দেশিকা (Prescription) অনুসরণ করে চলছে। তাদের চোখে যারা নবীকে নূরের তৈরী মনে করেনা এমন মুসলিমগণ যেন ইসলামে চিরশত্রুর চেয়েও বড় শত্রু। সঠিক সুন্নাতে রাসূলের অনুসারীদের অর্থবহ ও কার্যকর উপস্থিতি না থাকার দরুন ভ্রান্তপন্থীরা মাঠ দখল করে আছে। তবে আশার কথা হচ্ছে সুন্নাতে রাসূলের সঠিক ও বাস্তব রূপ চর্চার কিছু পদক্ষেপ লক্ষণীয় হচ্ছে।

যেসব সুন্নাতে রাসূলের অনুসারীদের উচিৎ ছিল উদ্ভট ও তথ্যহীন নীতি কথার স্থলে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে রাসূল (সা) প্রদর্শিত পন্থায় জীবন পরিচালনা করা, তাদের খাওয়া-দাওয়া, লেনদেন, কথা-বার্তা, আচরণ ব্যবহারে রাসূল প্রদর্শিত পথ বেছে নেয়া। নামায কায়েমের সাথে দীন ইসলাম কায়েমের কাজে নিয়োজিত হওয়া, সুন্নাতে রাসূলের তরিকায় দেশের আইন, শিক্ষা, সাংস্কৃতি, অর্থব্যবস্থা, ব্যাংক-বীমা পরিচালনার দাবীতে সোচ্চার হওয়া, এক কথায় মানব রচিত পথ ও দর্শনের স্থলে আল্লার ওলাইয়াত বা শাসন ব্যবস্থা এবং রাসূল (সা:) এর রিসালতের পদ্ধতিতে খিলাফত বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে আত্ম নিয়োগ করা। তা না করে তারা

---

১৩. আল কোরআন, আল নামল, ২৭:৬৫, লোকমান, ৩১:৩৪, আল জ্বীন, ৭২: ২৬

১৪. আল কোরআন, হুদ, ১১:৩১

রাসূলের (সা) দৈহিক গঠন প্রক্রিয়া, তার জন্ম দিবস পালন এবং এতে আনন্দ মিছিল (জশনে জুলুস) করা, তিনি গায়েব জানেন কিনা, সকল সৃষ্টি কূলের পূর্বেই তার জন্ম হয়েছিল কিনা, মিলাদ অনুষ্ঠানে তিনি হাজির হন কিনা, মিলাদীদের সকল কার্যক্রম দেখেন কিনা? এসব ভিত্তিহীন এবং বিতর্কিত বিষয় নিয়েই তারা এমন ব্যস্ত। যেন এটাই তাদের জীবনের একমাত্র মিশন। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, আল্লার আশেক বা প্রেমিক হওয়ার স্থলে আশেক রাসূল হওয়াই যেন তাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। আল্লাহর আবেদের স্থলে রাসূলের আবেদ হওয়া, আল্লার নিকট দয়া ও মুক্তি কামনার স্থলে রাসূলের নিকটই সে আকুতি পেশ করা হচ্ছে। বাংলা, উর্দু সাহিত্য, গানে, গজলে এর ভুরি ভুরি উদাহরণ বিদ্যামান[১৫]। সুন্নাতের দাবীদারদের উচিৎ ছিল ইসলামের বিপরীত চিন্তার মত ও পথের দাবীদার এবং এর অনুসারীদের বিপক্ষে অবস্থান নেয়া, তা না করে তাদের অধিকারংশই ঐসব রাজনীতিবিদ, সমাজপতি, ব্যবসায়ী ও বুদ্ধি জীবীদের পক্ষ নেন এবং ইসলাম পন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের ভাষায় কথা বলাই যেন তাদের দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। এটা একটা আশোভনীয় লক্ষণ। কারণ যে কোন ধর্ম বা দর্শনের বিপর্যয় এবং বিতাড়নের জন্য প্রাথমিক ভাবে ঐ ধর্মের গুরু বা আলেমরাই দায়ী। মুসা (আ:) এর সাহাবী রেববীরা, ঈসা (আ:) এর সাহাবী হাওয়ারীরাই প্রথমে ঐ সব ধর্মের বিকৃতি চড়াতে শুরু করে, যার ফলে আল্লার একত্ববাদী সে সব দ্বীন-ধর্মগুলো আজ প্রায় মুশরিকী ধর্মে পরিণত হয়েছে। এসব হয়েছে কখনো সচেতনভাবে আবার কখনো অচেতনাভাবে। সুন্নাতী জামায়াত যা করছে তা ঠেকাতে না পারলে ইসলামের অবস্থাও করুণ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছতে বাধ্য।

উপসংহার

আল হামদু লিল্লাহ- আল্লার বিশেষ দয়ায় শারীয়া বা আইনের উৎস হিসেবে সুন্নাতে রাসূল বিষয়ক বিশাল বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে শেষ করা হয়েছে। এ লিখনীতে যে বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে, তা হলো প্রথমত: সুন্নাহর অর্থ এবং এর প্রয়োজনীয়তা, দ্বিতীয়ত: সুন্নাতে রাসূল হচ্ছে মানবীয় আচরণ প্রসূত বিধিব্যবস্থা অথচ এ আচরণকেই কোরআনের সমপর্যায়ের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ের যৌক্তিকতা পেশ করা হয়েছে এতে। তৃতীয়ত: সুন্নাহর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যে প্রশ্ন বা মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে এ বিষয়ে আলোকতপাত করা হয়েছে এবং দৃঢ়তার সাথে সমালোচকদের সমালোচনার যৌক্তিক জবাব দেয়া হয়েছে। চতুর্থত: সুন্নাহ আইনের মৌলিক উৎস হওয়ার ক্ষেত্রে যে তিনটি মানদন্ড থাকা থাকা দরকার সুন্নার ক্ষেত্রেও তা উপস্থিত তা পেশ করা হয়েছে। মানদন্ড বা শর্তগুলো হলো: সুন্নাহর নির্ভুলতা, চিরস্থায়িত্বতা এবং সুন্নাহর কাজ বা ভূমিকা। পঞ্চমত: সুন্নাতে রাসূলের ক্ষেত্রে সুন্নার কট্টর অনুসারীদের মধ্যে রাসূল (সা:) এর গঠন, তার ক্ষমতা, যেমন গায়েব জানা বিষয়ক বিকৃতি প্রবেশ

---

১৫. একটি উর্দু গজলের শুরু হচ্ছে এভাবে কেউ যাকে পলটে আওয়ে দরবারে মুহাম্মাদ "এমন কে আছে যে রাসূলের দরবার থেকে খালি হাতে ফিরে আসে যা চাইতে হয় আমরা রাসূলের কাছেই চাইবো, কবরে অন্ধকারে থেকে বাঁচার জন্য রাসূলের দ্বারস্থ হবো।

করলো কিভাবে এবং তা দূরীকরণের উপায় আলোচনা হয়েছে এবং এর প্রভাব কি হচ্ছে বা হতে পারে তা পেশ করা হয়েছে এবং উত্তরণের উপায়ের আশাবাদ এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে রাসূলের পদ্ধতিতে খিলাফত বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন ও পরিচালিত হওয়া যা হয়েছিল রাসূলের যুগে এবং পরবর্তীতে রাশেদীন খলিফাদের যুগে। অতপর পারিবারিক তন্ত্র এবং শৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসানের পর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে রাসূলের পদ্ধতির শাসন।[১৬] সুদিনের পূর্বে যে দুর্দিন সমকালিন বিশ্ব ভোগ করে চলছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে সুন্নাতুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূল (সা.) এর অর্থ, গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং এর ভূমিকা (Rolel function) না বুঝা এবং তা অবজ্ঞা করা। এ অবজ্ঞার কারণ হচ্ছে অতিমাত্রায় অনৈতিকতার প্রচার ও প্রসার। আর এরমূলে রয়েছে আল্লাহর একত্বাবাদে অবিশ্বাস, পৌলিকতাবাদ, ধর্মহীনতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, পর্দাহীনতা, লাম্পট্য, নীতিহীনতা, অসাধুতা, কামুকতা, অন্যায় ভোগ বিলাশ, হিংসা বিদ্বেষ, লোভ, মিথ্যাবাদের চর্চা, আমানতের খেয়ানত, আত্মম্ভরিতা, অহংকার, পরনিন্দা চর্চা, দাম্ভিকতা, রক্ত পিপাসূতা, ঘুষ, সুদ, জেনা, ব্যবিচার, তোষণ আর শিষ্টের দমন, শিক্ষার নামে অশিক্ষা, কুশিক্ষার চর্চাসহ বহুবিদ নেতিবাচক কর্মের সরব উপস্থিতি। এ সব দুষ্টদোষে আলেম সমাজ তথা সুন্নাতের অনুসরণের দাবীদারগণও মুক্ত নন বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আসক্ত। আলেম ওলামাদের প্রসংসনীয় ভূমিকা যেমন-বিশাল অর্জন একই সাথে তাদের বিভেদও সুন্নাতে রাসূলের তরীকায় দ্বীন কায়েমের পথে বিশাল বর্জন। আশার কথা হচ্ছে, সুন্নাহ কনফারেন্স বাংলাদেশে আল সুন্নাহ ট্রাষ্ট, আল সুন্নাহ ফাউন্ডেশন সহ কতিপয় সংগঠন সুন্নাতে রাসূলের উজ্জীবনের একটি সময়েপোযোগী প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আশার আলো জ্বল জ্বল করছে। আশা করছি তারা পরস্পরিক সখ্যতার মাধ্যমে, সুন্নাতে রাসূলের পদ্ধতিতে দীন কায়েমের সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনার এ মহান দায়িত্বটি আল্লাহ সন্তুষ্টি আশায় আনজাম দিয়ে যাবেন। তাদের সাফল্য কামনায় শেষ করছি এ নাতিদীর্ঘ লেখনিটি। আল্লাহ যেন সকলের সহায় হোন। ■

> সুন্নাতে রাসূল আজ মৃতপ্রায়। ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার পরিচালনায় স্থান করে নিয়েছে সুন্নাহ বিরোধী সকল প্রথা, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, নারীনীতি, ব্যাংক বীমা নীতি, যুদ্ধনীতি, সন্ধিনীতি, বিচার নীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানব প্রসূত এবং মানব প্রদত্তনীতির সমাহার রাসূলের নীতিকে প্রায় বিলীন করে দিয়েছে। এ অবস্থায় সুন্নাতে হাসানার পুন:জীবন সময়ের দাবী।

১৬. মুসনাদ ইমাম আহমদ, ভলিউম ৪/২৭৩ (Combind number 18430).

৪২ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

হিকমাহ : ইসলামী দাওয়াহ'র অন্যতম পদ্ধতি

ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম[১]

দাওয়াত দান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামের প্রতিটি বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া জরুরী। দাওয়াত দান ফরজ। তবে হিকমতের সাথে দাওয়াত দিতে হবে। প্রজ্ঞাহীনকে হিকমতের সাথে আহ্বান করতে হবে। আলোচ্য নিবন্ধে ইসলামী দাওয়াত প্রচারে হিকমাহ এর স্বরূপ আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

হিকমতের সংজ্ঞা

হিকমত (حِكْمَةٌ) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো : দর্শন, বিজ্ঞতা, তত্ত্বজ্ঞান, জ্ঞান, বিচক্ষণতা, পরিণামদর্শিতা, নবুওয়াত, কুর'আন বুঝা, দ্বীন বুঝা ও অনুসরণ করা, সুন্নাত, আল্লাহর ভয়, আকল বা বুদ্ধিমত্তা, ওহী, তত্ত্বজ্ঞান ও দর্শন ইত্যাদি।[২]

পারিভাষিক অর্থ

১. ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী রহ. বলেন :

هي الإصابة في القول والفعل ووضع كل شيئ موضعه.

"কথা ও কাজে সঠিক তথা যথাযথ এবং প্রত্যেকটি বিষয়কে যথাযথ স্থানে রাখাকেই হিকমত বলে।"[৩]

২. ইব্‌ন যায়েদ রা.-এর মতে,

الحكمة شيئ يجعله الله في القلب ينور له به.

"হিকমত এমন একটা বস্তু, যা আল্লাহ্ তা'আলা (মানুষের) অন্তরে স্থাপন করে দেন, যার দ্বারা তা আলোকময় হয়ে ওঠে।"[৪]

৩. ইবনুল কায়্যিম আল জাওযী রহ. বলেন :

الحمة إصابة الحق والعمل به، وهي العلم النافع والعمل الصالح.

"হিকমত হলো সত্যে উপনীত হওয়া এবং সে অনুসারে কাজ করা এবং এটি হলো উপকারী বিদ্যা ও নেক কাজ।"[৫]

উল্লেখ্য যে, হিকমতের অর্থ ব্যাপক। যা সংক্ষেপে কোনো ভাষায় অনুবাদ করে বুঝানো সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী

---

১. সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।

২. কুরতুবী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আবু বকর ইব্‌ন ফারাহ, *আল-জামি'উ লি আহকামিল কুর'আন* (কায়রো : দারুশ শায়ব, ১৩৭২ হি.), খ. ৩, পৃ. ৩৩০।

৩. ফখরুদ্দীন আর-রাযী, *তাফসীরে মাফাতিহুল গায়ব* (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছ আল-আরাবী, ১৪২০ হি.), খ. ৪, পৃ. ৭৪।

৪. আত-তাবারী, আবূ জা'ফার মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর, *জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুর'আন*, (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৩৩২।

৫. মিফতাহু সাআদা, খ. ১, পৃ. ৫১।

রহ. বলেন :

الحكمة الكلمة البليغة العربية التي جاءت في الأي لا اعتقد أنها من الممكن ترجمتها أو نقلها إلى لغة أخرى.

"হিকমত শব্দটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আরবী একটি শব্দ। এটি অন্য ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না।"[৬]

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী বলেন, "ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত বলতে বুঝায়, একজন দা'ঈ কর্তৃক পরিবেশ, পরিস্থিতি বুঝে সত্য দ্বীন তথা ইসলামকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা ও বাস্তবায়ন করা।"[৭]

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের গুরুত্ব

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত বা প্রজ্ঞার গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন পদ্ধতিতে দা'ওয়াত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হিকমত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ দা'ওয়াত প্রচারে হিকমত ব্যতীত কখনই সুফল পাওয়া যায় না। নিম্নে ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **বড় নিয়ামত :** হিকমত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় নিয়ামত। এটি ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে চালিকা শক্তির ন্যায় কাজ করে থাকে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকেই তা প্রদান করে থাকেন। যেমন প্রদান করেছিলেন লুকমান আ. কে। মহান আল্লাহ বলেন :

    وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

    "আমি তো লুকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজেরই জন্য এবং কেহ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।"[৮]

২. **অধিকতর কল্যাণকর :** হিকমত একটি বড় নিয়ামত। যার মধ্যে এটি পাওয়া যাবে, তার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। যার প্রমাণ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। এটি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অধিক কল্যাণকর কাজের নির্দেশ করে থাকে। আর এ মহান নিয়ামতটি যাকে ইচ্ছা তাকেই দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন :

    يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.

    "তিনি যাকে ইচ্ছা হিক্মত প্রদান করেন এবং যাকে হিক্মত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়; এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে।"[৯]

---

৬. রাওয়াইউ মিন আদাবিদ দা'ওয়াহ, পৃ. ১৫।
৭. আব্দুর রহমান আনওয়ারী, *ইসলামী দা'ওয়াহ: স্বরূপ ও প্রয়োগ*, পৃ. ১৮১।
৮. সূরা লুকমান, ১২।
৯. সূরা আল-বাকরা, ২৬৯।

৩. **দা'ওয়াতের প্রধান পদ্ধতির অন্যতম :** দা'ওয়াত দানের যে সকল পদ্ধতি মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন; তন্মধ্যে এটি অন্যতম। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন :

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .

"আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা (হিকমত) বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।"[১০]

৪. **নবীগণের অনুসরণ :** হিকমত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের প্রদত্ত ঐশী নি'আমত। তাঁরা দা'ওয়াত উপস্থাপনে এ পদ্ধতি ব্যবহার করে দা'ওয়াতী কাজে সফল হয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ .

"যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দেয় আর তোমরা যা জানিতে না তা শিক্ষা দেয়।"[১১]

হিকমতের দ্বারা দা'ওয়াত দিলে দা'ওয়াতী কাজে অধিক সফলতা অর্জন সম্ভব হতে পারে।

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত প্রয়োগের পদ্ধতি

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দা'ওয়াত উপস্থাপন করতে হয়। তন্মধ্যে হিকমত হলো একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। তবে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত প্রয়োগেরও কিছু বিবেচনার দিক রয়েছে। যেমন সময় বিবেচনা। কারণ সব সময় দা'ওয়াত দিলেই মানুষ তা গ্রহণ করতে নাও পারে। এ জন্য সময় সুযোগ বুঝে মানুষের কাছে দা'ওয়াত উপস্থাপন করতে হবে। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো :

১. **সময় নির্বাচন :** উদ্দিষ্ট ব্যক্তি দা'ওয়াতের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে, এমনি সম্ভাব্য একটা সময় নির্বাচন, যাকে দা'ওয়াত দেয়া হচ্ছে, সে যদি অন্য কোনো জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকে, তবে সে সময়ে তাকে দা'ওয়াত দেয়া যাবে না। কারণ এ সময় দা'ওয়াত দিলে তা ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। মহান আল্লাহর বাণী :

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.

"অতঃপর (আপনি) উপদেশ দিন, যদি তা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করেন।"[১২]

---

১০. সূরা আন-নাহল, ১২৫।
১১. সূরা আল-বাকারা, ১৫১।
১২. সূরা আল-আ'লা, ৯।

২. **মাদউর পরিচয় জানা ও আপনকরণ :** ইসলামী দা'ওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে হিকমতের অপর একটি প্রয়োগিক নমুনা হলো মাদউর পরিচয় জানা ও তাকে আপন করে নেয়া। কারণ, যখন একজন ব্যক্তিকে খুব কাছে টেনে নেয়া যায় তখন সে যে কোনো প্রকার কথা মানতে এক প্রকার বাধ্য হয়ে যায়। যেমনটি ইউসুফ আ. করেছিলেন। মহান আল্লাহর ভাষায় :

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.

"আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইস্হাক এবং ইয়া'কূবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহ্র সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। ইহা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"[১৩]

৩. **প্রথমে দা'ওয়াত গোপন রাখা :** অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রথমে মাদউর নিকট দা'ওয়াতী মিশনকে গোপন রেখে আগে তার কাছাকাছি হবে। যেমন পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন ইউসুফ আ. জেলখানায়। মহান আল্লাহ্ বলেন :

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

"হে কারা সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতকগুলি নামের ইবাদত করছো, যে নামগুলি তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহ্রই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারও ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত; এটাই শাশ্বত দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে অবগত নয়।"[১৪]

৪. **দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করা :** ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সময় নিয়েই সুযোগ মতো দা'ওয়াত উপস্থাপন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভবনাও রয়েছে। তাই ধীর-স্থির ও সংযমের সাথেই দা'ওয়াত দেয়াই শ্রেয়। মহান আল্লাহ্ বলেন :

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ.

"অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ করো যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। তুমি তাদের জন্য ত্বরা করো না।"[১৫]

৫. **সময়ের সদ্ব্যবহার :** দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত হলো দাঈ যখনই সুযোগ পাবে

---

১৩. সূরা ইউসুফ, ৩৮।
১৪. সূরা ইউসুফ, ৩৯-৪০।
১৫. সূরা আল-আহকাফ, ৩৫।

ঠিক তখনই দা'ওয়াত উপস্থাপন করা। যেমনটি ইবরাহীম আ. নমরুদের সামনে করেছিলেন।

৬. **উত্তম আচরণ করা :** উত্তম ব্যবহারের দ্বারা মানুষ মানুষকে আপন করে নিতে পারে। যা ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে একটি খুবই ফলপ্রসূ পদ্ধতি। এটি একটি হিকমত প্রয়োগের অপর পদ্ধতি। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.

"আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত।"[১৬]

৭. **মন্দের জবাবে উত্তম আচরণ করা :** মন্দ আচারণের জবাব উত্তম আচরণের মাধ্যমে দেয়া নিঃসন্দেহে একটি পূণ্যের কাজ। তাই দাঈকেও এমন চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। এর ফলে লোকেরা তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে দা'ওয়াত গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

" ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সঙ্গে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।"[১৭]

৮. **ধৈর্য ধারণ করা:** ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা এটি নতুন কিছু নয়। পূর্ববর্তী যামানার সকল নবী-রাসূলদেরকেও দা'ওয়াতী কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। তাই বলে সেখানে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। এ ক্ষেত্রে উত্তম ধৈর্যধারণ করাই হলো হিকমতের প্রয়োগ। যেমনটি আমাদের নবী সা. করেছিলেন। মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.

"লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করো এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চল।"[১৮]

৯. **হাস্যজ্জ্বল চেহারা :** কারো নিকট দা'ওয়াত উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে হাসি মুখে উপস্থিত হওয়া ইসলামী দা'ওয়াতের কৌশলগত হিকমত। এর দ্বারা মাদউ-এর মনে দা'ওয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া সম্ভব। আর এটি ছিলো আমাদের নবী সা.-এর সার্বক্ষণিক একটি সুন্নাত।

১০. **ক্ষমা করা :** ক্ষমা মহত্বের পরিচয় বহন করে। এটি দাঈর একটি মৌলিক গুণ। তার ভেতর যদি মাদউকে ক্ষমা করার প্রবণতা না থাকে তাহলে লোক তার থেকে দূরে সরে যাবে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী সা.কেও ক্ষমা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন :

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

---

১৬. সূরা ফুসসিলাত, ৩৪।
১৭. সূরা ফুসসিলাত, ৩৪।
১৮. সূরা আল-মুযাম্মিল, ১০।

"সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজেকর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে, যারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন।"[১৯]

১১. সত্য ও অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে দা'ওয়াত : হিকমতপূর্ণ দা'ওয়াতী পদ্ধতির জন্য শর্ত হলো কোনো বাতিল বা ভূল-ভ্রান্তি কিংবা অলীক কাল্পনিক বিষয়ের আশ্রয় নেয়া যাবে না। সকল কথা, কাজ সত্যনিষ্ঠতার সাথে হতে হবে।

১২. পর্যায়ক্রমে দা'ওয়াত : দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু বা নির্দিষ্ট কোনো বিষয়কে এক সাথে উপস্থাপন হিকমত সমর্থিত নয়। বরং তা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে হবে।

১৩. সহজ ভাষায় উপস্থাপন : ইসলামী দা'ওয়াত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে দাঈকে অবশ্যই সহজ ও সাবলীল ভাষা ব্যবহার করতে হবে। কারণ যে ভাষা মানুষের পক্ষে বোধগম্য করা কঠিন সে ভাষায় দা'ওয়াত দিলে ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়েকিরাম এমনই করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠাইয়াছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২০]

১৪. গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনবার উল্লেখ করা : ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে উত্তম উপদেশ উপস্থাপনে দা'ঈ মাঝে মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনবার বলবেন। যেমনটি আমাদের নবী সা. করতেন। হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا. "আর যখন তিনি কথা বলতে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন।"[২১]

১৫. আবেগ-উচ্ছাস : আবেগ-উচ্ছাস দা'ওয়াত উপস্থাপনের একটি অন্যতম কৌশল। এটি মাউয়িযায়ে হাসানা উপস্থাপনের অপর একটি মূলনীতি। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ সা. যখন বক্তৃতা দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল ও ছল ছল করতো।"[২২]

১৬. উৎসাহ-উদ্দীপনা : ইসলামী দা'ওয়াতে উৎসাহ উদ্দীপনা একটি অন্যতম পদ্ধতি। যেমন নূহ আ. তাঁর স্বজাতিকে দা'ওয়াত গ্রহণের নিমিত্বে আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার কথা উল্লেখের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করতেন, যেন তাঁর সম্প্রদায় দুনিয়াতে শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভ করে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছেঃ

---

১৯. সূরা ফুসসিলাত, ৩৪।

২০. সূরা ইবরাহীম, ৪।

২১. বুখারী, আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল, *আল-জামে'উস সহীহ* (বৈরূত : দারু ইব্ন কাছীর, ১৪০৭হি.), হাদীস নং-৯৩।

২২. মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম (বৈরূতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাছ আল-আরাবী, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৫৯।

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ . يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ .

"(নূহ সা. বলল) তোমরা সকলে এক আল্লাহর দাসত্ব কর,তাঁকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন।"[২৩]

১৭. বিনয় ও নম্র ভাষা ব্যবহার : দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো নম্রভাষায় তা উপস্থাপন করা। এতে মানুষের মন সহজেই নরম হয়ে যা। এ জন্য মহান আল্লাহ্ মূসা আ.কে এই পদ্ধতিতে দা'ওয়াত দেয়ার নির্দেশ দেন। মহান আল্লাহ্ বলেন :

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى.

"তোমরা তার সঙ্গে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।"[২৪]

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি দা'ওয়াতের একটি অন্যতম পদ্ধতি ও কৌশল। দা'ঈ যদি দা'ওয়াত দানের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অবলম্বন করে দা'ওয়াত দেন; তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারেন।মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে ইসলামী দা'ওয়াত দেয়ার জন্য যে সকল পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে; তন্মধ্যে হিকমত অন্যতম। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন হিকমত ব্যবহার করে থাকেন দা'ঈ। যা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে একটি ফলপ্রসূ পদ্ধতি ও কৌশল। আমীন। ■

২৩. সূরা নূহ, ৩-৪।
২৪. সূরা ত্বাহা, ৪৪।

ধর্ম ও বিজ্ঞান ভাবনা

আব্দুল মান্নান

আল-কুরআন থেকে উৎসারিত দ্বীন বা জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। ইসলামকে আমরা সাধারণভাবে ধর্ম বলে থাকি। ইসলাম ছাড়াও পৃথিবীতে আরো অন্যান্য ধর্ম রয়েছে। কম বেশী সকল ধর্মেই বিজ্ঞান ভাবনা রয়েছে। ধর্ম ও বিজ্ঞানকে জড়িয়ে আমাদের মাঝে বিস্তর কথাবার্তা আছে । ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সংঘর্ষ নাকি সন্ধি এটা নিয়েও আমরা অনেকেই যথেষ্ট সন্ধিহান। ইতিহাসের পাতায় কোনো কোনো ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের চরম বিরোধের ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। তবে পবিত্র কুরআন থেকে উৎসারিত ধর্ম ইসলামের সাথে প্রকৃত বিজ্ঞানের বিরোধ অতীতে ছিলনা, বর্তমানেও নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবেনা।

ধর্ম মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য সামগ্রিক দিক নির্দেশনা এবং ইহ জাগতিক সার্বিক কার্য-কলাপ মৃত্যুর পরের জীবনে কি প্রভাব ফেলবে তারও সুস্পষ্ট বর্ণনা দেয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক জগতকে জানার একটা অন্যতম মাধ্যমও বটে। মানুষ বিভিন্ন বিশ্বাসের ভিত্তিতে কিছু আচার অনুষ্ঠান ও প্রাত্যহিক কাজের মধ্য দিয়ে ধর্ম পালন করে। বিশ্বাসই হচ্ছে ধর্মের মূল কথা। মহাপ্রভুর পক্ষ থেকে নির্বাচিত এক দল মহামানব (নবী ও রাসুল) তাঁরই দ্বারা আদিষ্ট হয়ে মানব জাতিকে বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের শিক্ষা দিয়েছেন। এ সব মহামানবগণের প্রতি আস্থা রেখেই ধর্মপ্রাণ লোকেরা ধর্ম পালন করেন। বিশ্বাসীগণ তাঁদের (মহামানবগণের) প্রচারিত বাণীর স্বপক্ষে কোন সময়ই যুক্তি অথবা প্রমাণ দাবি করেননি। কারণ একটাই, আর তা হল, মহামানবগণের প্রতি অগাধ আস্থা।

সুব্যবস্থিত জ্ঞান ও কাজকে আমরা সাধারণ ভাবে বিজ্ঞান বলতে পারি। প্রাকৃতিক জগত ও বস্তু সম্বন্ধে জানার আরও একটি ব্যবস্থা। বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রদান করে। এ ব্যবস্থা মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে কিছুই বলেনা।

বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃতি ও পদার্থের বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যে সব তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন করা হয় তা সকল মানুষের নিকট বোধগম্য হবে এমনটি কেউই দাবি করতে পারবেনা। উক্ত বিষয়ের ওপর কোন ব্যক্তির যদি যথাযথ জ্ঞান থাকে তাহলেই সে তা বুঝতে সক্ষম হবে। দৃষ্টি শক্তির সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করে গোচরীভূত সীমানার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পাওয়া সমতল পৃথিবীটাকে গোলাকার বা তদ্রুপ আকারের বিজ্ঞানের

মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে হলে যুক্তি ও প্রমাণ পেশ করতে হবে। কারণ বিজ্ঞানের মূল কথাই হচ্ছে যুক্তি ও প্রমাণ। বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি এবং জ্ঞানীদের জন্য যুক্তি ও প্রমাণ বুঝার ব্যাপারে খুব একটা সমস্যা হয়তো হবেনা । কিন্তু বিপত্তি ঘটবে তখনই, যখন কোনো ব্যক্তি যুক্তি বুঝতে অক্ষম হবে। সমস্ত পৃথিবীটাকে তো আর হাতের মুঠোয় পুরে তাকে বুঝানো সম্ভব নয় যে, এটি গোলাকার। তাহলে যুক্তি না বোঝা ব্যক্তির উপায় কি? উপায় একটাই, আর তা হল যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীদের কথা অন্ধভাবে হুবহু বিশ্বাস করা। উল্লেখ্য, যুক্তি বুঝতে অক্ষম ব্যক্তিদের সংখ্যাই পৃথিবীতে বেশী। এ সকল মানব সন্তান যুক্তিবাদী ও দার্শনিকদের উপর আস্থা রেখে তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী দুনিয়াবী সকল কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন।

যে কেউ যত বড়ই বিজ্ঞানী হোননা কেন মানুষ হিসেবে তাঁর জ্ঞানের একটা সীমাবদ্ধতা থাকতে বাধ্য। তাহলে সকল ক্ষেত্রে কি বিজ্ঞানীদের উপর আস্থা রাখা যায়? আমাদেরকে যখন কারো উপর আস্থা রাখতেই হবে তখন মহান প্রভুর পক্ষ থেকে নির্বাচিত ও হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের প্রতি আস্থা রাখা এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলাটা কি অধিক যুক্তি গ্রাহ্য নয়? তবে কুরআন-সুন্নাহ্ এবং ঈমান-আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন সব বিষয়ের উপর বিজ্ঞানীদের দেয়া তত্ত্ব ও তথ্যের উপর আস্থা রাখতে আপত্তি নেই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে ধর্ম এবং বিজ্ঞান উভয়ের প্রতি সমর্থন আছে এরূপ বিশাল এক জনগোষ্ঠী আস্থা রাখে হয়তোবা নবী-রাসূলদের প্রতি নয়তোবা বিজ্ঞানীদের প্রতি। ইতিহাসের পাতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই, বিজ্ঞানের কোনো কোনো তত্ত্ব কোনো এক সময় বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কিন্তু কালের আবর্তনে তা পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন, এক সময় বিজ্ঞানীরা মনে করতেন আমাদের এ মহাবিশ্বের কোন শুরু ছিলনা। অনাদিকাল থেকে এমনটি ছিল এবং এমনই থাকবে, এর কোন ধ্বংস নেই। বর্তমানে আগের ঐ তত্ত্বের

সাথে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতবিরোধ ঘটেছে। মহাবিশ্বের শুরু ছিল এবং তা একদিন ধ্বংস হবে এ ধারণা বর্তমানে স্বীকৃতি লাভ করেছে। টলেমির ভূকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা ১৫০০ বছর রাজত্ব করলেও এখন আর তা নেই।

যে কেউ যত বড়ই বিজ্ঞানী হোননা কেন মানুষ হিসেবে তাঁর জ্ঞানের একটা সীমাবদ্ধতা থাকতে বাধ্য। তাহলে সকল ক্ষেত্রে কি বিজ্ঞানীদের উপর আস্থা রাখা যায়? আমাদেরকে যখন কারো উপর আস্থা রাখতেই হবে তখন মহান প্রভুর পক্ষ থেকে নির্বাচিত ও হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের প্রতি আস্থা রাখা এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলাটা কি অধিক যুক্তি গ্রাহ্য নয়? তবে কুরআন-সুন্নাহ্ এবং ঈমান-আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন সব বিষয়ের উপর বিজ্ঞানীদের দেয়া তত্ত্ব ও তথ্যের উপর আস্থা রাখতে আপত্তি নেই।

কোনো কোনো ব্যক্তির লিখনি বা আলোচনা থেকে মুসলিম সমাজে এমন একটা আবহ সৃষ্টি হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে অল্প শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত এবং শিক্ষিত অধিকাংশ মুসলমানেরা মনে করেন বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কারই হয়েছে কুরআন থেকে। আর অমুসলিমরা তা করেছে রীতিমতো আল-কুরআন থেকে চুরি করে। আল-কুরআনের ব্যাপারে এ ধরণের প্রচারের কারণে কোন ব্যক্তি যদি এটাকে বিজ্ঞানের বই ভেবে বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে পড়তে শুরু করেন তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে বেকায়দায় পড়বেন এবং পথভ্রষ্ট হবেন। কারণ প্রচলিত বিজ্ঞানের বইয়ের মতো তো আর আল-কুরআন বিজ্ঞানের বই নয়। আল্লাহ্ (سبحانه و تعالى) বলেননিও তা। কুর'আনের পক্ষে আল্লাহ্র ঘোষণাঃ

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

"এটি আল্লাহর কিতাব, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এটি হিদায়াত 'মুত্তাকীদের জন্য", (২-বাকারাহ্ : ২)। তবে তিনি তাঁর বান্দাহদেরকে জ্ঞান দানের জন্য বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত অনেক আয়াতও নাজিল করেছেন। এতে করে একথা বুঝে নেয়া ঠিক নয় যে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মত সেগুলিও হুবহু একই রকম তত্ত্ব। কুরআন থেকে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের কথাটা আল-কুরআনে বিশ্বাসী লোকদের নিকট স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক মনে হলেও একজন অবিশ্বাসীর জন্য তা হতে পারে অসামঞ্জস্যশীল একটা উক্তি। আর এ ধরনের উক্তির কারণেও হয়তো অনেকে আল-কুরআন নাজিলের আসল উদ্দেশ্য থেকে দূরে থেকে যেতে পারেন।

আল-কুরআন গবেষকদের মধ্যে একদল রয়েছেন যাঁরা আল্লাহর দেয়া হুকুম গুলি চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন। ফলে গবেষণামূলক কাজটি একজন মানুষকে শিরক বিদ'আত সহ নানা ধরনের আল্লাহ পাকের নাফরমানী মূলক কাজ থেকে দূরে রেখে তাঁর খাঁটি গোলাম হতে সাহায্য করে। এ কাজের জন্য সাধুবাদ পেতে পারেন তাঁরা। তবে চলমান বিশ্বের ঘটনা প্রবাহ বিশেষ করে বিজ্ঞানের জগতে কুরআন কি ধরণের অবদান রাখতে পারে তা নিয়ে এ দলের গবেষকগণ খুব

একটা মাথা ঘামাননা। তার কারণ, বিজ্ঞানের জগতে তাঁদের পদচারণা খুবই কম। বিজ্ঞান হচ্ছে যুক্তি-তর্ক ও প্রমাণের ব্যাপার, কাজেই তাঁরা ধর্ম-বিশ্বাসের সাথে যুক্তি তর্ক গুলিয়ে ফেলতে নারাজ।

গবেষকদের মধ্যে আর একটি দল রয়েছে, যার সদস্যগণ নাযিলকৃত বিজ্ঞানের ইঙ্গিত বহনকারী আয়াত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। ধর্ম গ্রন্থের (আল-কুরআন) নিদর্শনের সাথে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিস্কারের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে বের করার জন্য বুদ্ধিদীপ্ত এ দলের গবেষকগণ এক যোগে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি আত্মস্থ করে কুরআনের বিজ্ঞান সংক্রান্ত আয়াতগুলির ব্যাখ্যা প্রদান নেহায়েতই ছেলে খেলা নয়। এটাও একটা জটিল কাজ হওয়ায় নিঃসন্দেহে তাঁরাও সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। বিশ্ববাসীর সামনে আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণই যে তাঁদের উদ্দেশ্য তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু শুধুমাত্র সামঞ্জস্য খোঁজার মাধ্যমে কি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা সম্ভব?

উপরে উল্লেখিত বুদ্ধি দীপ্ত দ্বিতীয় দলের গবেষকদের অবদানের কথা স্মরণে রেখে এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই আল্লাহ্ (سبحانه و تعالى) যা স্পষ্ট করে প্রকাশ করেননি তা আমাদের ও তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির জন্য জানা বা অনুমান করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়ে নিশ্চয় করে বলা কঠিন যে, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক মহাবিষ্ফোরণ তত্ত্ব, কৃষ্ণ গহ্বর, গ্যালাক্সি বা অন্য যে কোন তত্ত্বের কথা হুবহু বলেছেন। আমরা জানি বিজ্ঞানের তত্ত্ব পরিবর্তনশীল। আজ যে তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক বলে মনে করা হচ্ছে কালের পরিক্রমায় তা পরিবর্তনও হতে পারে। অপর পক্ষে কুরআন সকল যুগের মানুষের জন্য অপরিবর্তনীয় এক অমোঘ বাণী।

পবিত্র কুরআনকে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হিসাবে বিশ্ববাসীর নিকট প্রকাশ করতে হলে গবেষকদেরকে আল-কুরআনের অপরাপর বিভাগের জ্ঞান আয়ত্ত করার সাথে সাথে বিজ্ঞানের জগতেও মনোনিবেশ করতে হবে। তার জন্য দরকার উল্লেখিত বুদ্ধিদীপ্ত উভয় দলের (ধর্ম ও বিজ্ঞান) গবেষকগণের একই প্লাটফরমে এসে কাজ করা। আল-কুরআনের যে জ্ঞান এক সময় পৃথিবীবাসীকে করেছিল আলোকিত ও ধন্য, তা অনুসন্ধান করতে হবে নিজেদের দায়িত্ব হিসেবেই। কোনো কালেই আল-কুরআনে উপস্থাপিত দ্বীন বা ধর্ম ইসলামের সাথে প্রকৃত বিজ্ঞানের সংঘর্ষ ছিলনা। আর যদি থেকে থাকেও, তা হয়েছে আমাদের জ্ঞানের অভাবের কারণে। কাজেই আল-কুর'আন থেকে একদেশদর্শী জ্ঞান নয় বরং বহুমূখী জ্ঞান অর্জন এবং সে আলোকে যৌক্তিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচারই হতে পারে আল-কুরআনকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার কর্যকরী পদক্ষেপ। ■

গাজায় যুদ্ধ চলছেই

মীযানুল করীম

গাজা যুদ্ধকে ইসরাইল আরো প্রলম্বিত ও বিলম্বিত করতে চাচ্ছে। ইসরাইল একাই গাজা তথা ফিলিস্তিন, লেবানন, সিরিয়া, ইরান ও ইয়েমেনের সাথে যুদ্ধ করতে চাচ্ছে। জর্ডানও তার মুখোমুখি। গাজায় প্রায় অর্ধলক্ষ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। লেবাননে হাজার হাজার আরব মারা গেছে। আর আহত ও পঙ্গু ফিলিস্তিনির তো লেখা-ঝোকা নাই। গাজার সাথে সাথে লেবাননও এক ধরনের নরকে পরিণত হয়েছে। ইসরাইল ওয়াদা ভঙ্গ করে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে চলেছে। হামাসকে তারা সহ্য করতে পারে না। কারণ তারা ইসলামপন্থী। এদিকে ইসরাইল যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরও ফিলিস্তিনিদের হত্যা করে চলেছে। তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না জাতিসংঘের স্কুল, হাসপাতাল, আশ্রয়কেন্দ্র, শরণার্থী শিবির প্রভৃতি। বাঁচতে পারছে না শিশু, রোগী, বৃদ্ধ, এমনকি সাংবাদিকও। তারা গাজায় ত্রাণসামগ্রী ও সাহায্য পাঠানোও বন্ধ করে দিয়েছে।

অবরুদ্ধ গাজা থেকে চার ইসরাইলি জিম্মির লাশ ফেরত দিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। রেডক্রসের হাতে এ চার ইসরাইলির লাশবাহী কফিন তুলে দেওয়া হয়। পরে রেডক্রস ইসরাইলি বাহিনীর কাছে কফিনগুলো তুলে দেয়। চার ইসরাইলির লাশই শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানান ইসরাইলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজা। তেল আবিরের ফরেনসিক সেন্টারে ওই চার ইসরাইলির লাশ শনাক্ত করা হয়েছে।

নিহত ওই চার ইসরাইলি হলেন, দক্ষিণ ইসরাইলের ইহুদি বসতি কিবুৎজ কিসুফিনের বাসিন্দা ৮৬ বছর বয়সি শ্লোমো মানসুর, কিবুৎজ নাহাল ওজের ৫০ বছর বয়সি সাই ইদেন, কিবুৎজ নিব ওজের ৫০ বছর বয়সি ওহাদ ইয়াহালোমি ও ৬৯ বছর বয়সি আইজিক এলগারাত।

চার ইসরাইলির লাশ শনাক্তের পর ৬শর বেশি ফিলিস্তিনি বন্দির মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর মধ্যে ৪৫৬জন বন্দিকে ইসরাইলি কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে গাজায় ফেরত পাঠানো হয়েছে। ৩৭ বন্দিকে পশ্চিম তীরে ও ৫ জনকে জেরুসালেমে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আরো ৯৭ জন বন্দিকে মুক্তি দিয়ে মিসরে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে যুদ্ধবিরতির মধ্যেও গাজায় ইসরাইলি হামলা চলছে। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে 'আল জাজিরা' জানায়, ৪৮ ঘণ্টায় গাজায় ইসরাইলি হামলায় ১৭ জন নিহত ও ১৯ জন আহত হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে, সবমিলিয়ে গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৮ হাজার ৩৬৫ জন এবং আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক লাখ ১১ হাজার ৭৮০ জন।

হামাসের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে, ইসরাইলের প্রতি যুদ্ধবিরতির জন্য দ্বিতীয় ধাপে আলোচনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী

সংগঠনটি জানায়, 'আলোচনা শুরু করা ছাড়া ইসরাইলের হাতে আর কোনো পথ বাছাইয়ের সুযোগ নেই।

হামাস জানায়, শর্ত অনুযায়ী, ইসরাইলি জিম্মিদের লাশ ফেরতের বিনিময়ে ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি হয়েছে। এখন বাকি জিম্মিদের ফেরাতে চাইলে আলোচনার বাইরে ইসরাইলের কোনো পথ চাই। তবে ইসরাইলি জ্বালানি মন্ত্রী এলি কোহেন বলেছেন, গাজায় অবশিষ্ট জিম্মিদের ফেরত আনা অগ্রাধিকার হলেও যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় ধাপের আলোচনা তারা শুরু করবে না যতক্ষণ হামাস গাজা থেকে বিদায় না নেবে।

আমেরিকা, কাতার, মিসরের মধ্যস্থতায় দীর্ঘ আলোচনার পর গত ১৯ জানুয়ারী গাজায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে যায় ইসরাইল। ৪২ দিনের জন্য নির্ধারিত, অস্থায়ী এ যুদ্ধবিরতিতে গাজা থেকে ২৫ ইসরাইলি জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হয়। এছাড়া আট জিম্মির লাশ ফেরত পাঠানো হয়েছে।

এর বিনিময়ে ১ হাজার ৯০০ ফিলিস্তিনি বন্দির মুক্তির প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

দীর্ঘ ১৫ মাসের সংঘাত শেষে গত ১৯ জানুয়ারি থেকে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হয়। এই যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্যায় শেষের ধাপের পথে। এ পর্বে ৩৩ জন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার কথা হামাসের। তার বিনিময়ে ইসরাইলের কারাগারে আটক ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দেওয়ার কথা তেল আবিবের। তবে সম্প্রতি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ৬২০ ফিলিস্তিনি বন্দির মুক্তি স্থগিত করায় গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তির ভবিষ্যত অনিশ্চয়তা দেখা দেয় যদিও স্থগিত হওয়া ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তির বিষয়ে ইসরাইলের সঙ্গে সুরাহা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে হামাস। গাজা যুদ্ধ বিরতির চুক্তির দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনায় ৪টি শর্ত জুড়ে দিয়েছে ইসরাইল। যদি এই ৪ শর্ত পূরণ না হয়, সেক্ষেত্রে চুক্তির প্রস্তাবিত ২য় পর্যায় শুরুর ব্যাপারটি 'পুরোপুরি' অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে বলে জানিয়েছেন জ্বালানিমন্ত্রী এবং যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার অন্যতম গুরত্বপূর্ণ সদস্য এলি কোহেন।

ইসরাইলি টিভি চ্যানেল কান-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎ কারে কোহেন বলেন, যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় পর্যায়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ৪টি শর্ত রয়েছে। হামাসের কাছে থাকা সব জিম্মিকে মুক্তি দিতে হবে। শাসকগোষ্ঠী হামাসকে গাজা থেকে বিদায় নিতে হবে এবং গাজাকে অবশ্যই সম্পূর্ণ অস্ত্রমুক্ত করতে হবে। সেই সঙ্গে গাজা এলাকায় ইসরাইলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামলা চালিয়ে ইসরাইলের সীমান্তে প্রবেশ করে ১ হাজার ২০০ জনকে হত্যা করে হামাস ও মিত্রগোষ্ঠী প্যালেস্টিনিয়ান ইসলামিক জিহাদের যোদ্ধারা। সেই সঙ্গে ২৫১ জনকে জিম্মি হিসেবে ধরে নিয়ে যায় তারা। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর এটিই ইসরাইলে সবচেয়ে বড় হামলা।

হামাসের হামলার জবাব দিতে এবং জিম্মিদের উদ্ধার করতে গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরাইল। প্রায় ১৫ মাস ধরে অভিযান চলার পর যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রশাসনের চাপের মুখে ১৯ জানুয়ারী যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় ইসরাইল। গাজায় ১১ মার্চ থেকে যুদ্ধবিরতির

দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হওয়ার কথা। এ পর্যায়ে গাজায় স্থায়ীভাবে সংঘাত শেষ হওয়ার আলোচনা হবে। শর্ত অনুসারে; এ পর্যায়ে অবশিষ্ট জিম্মিদের মুক্তি দেবে হামাস। বিনিময়ে বিভিন্ন কারাগারে বন্দি ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ১ হাজার জনকে মুক্তি দেবে ইসরাইল এবং উপত্যকা থেকে ঈসরাইলি সেনাদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। তৃতীয় পর্যায়ে গাজা উপত্যকায় পুনর্গঠনের কাজ শুরু হবে।

ফিলিস্তিনি কারাবন্দিদের মুক্তি বিলম্বিত হওয়া নিয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল, তার সুরাহা হয়েছে বলে জানিয়েছে হামাস। হামাসের কায়রোর সফরে যাওয়া একটি প্রতিনিধি দল জটিলতা নিরসনে ঐকমত্যে পৌঁছেছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে রয়টার্স। হামাসের দেওয়া বিবৃতিতে জানানো হয়, বন্দি বিনিময় নিয়ে দুই পক্ষের সমঝোতা হয়েছে। ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটি বলছে, তাদের গাজা প্রধান খলিল আল হায়ার নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলটি যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রতিটি পর্ব, প্রতিটি ধারা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। তবে ইসরাইলের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

হামাস কর্মকর্তা কাসেম নাঈম বলেছেন, কারাবন্দিদের আটকে রেখে এ যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে সাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হামাস স্থায়ী যুদ্ধবিরতি ও গাজা থেকে সব ইসরাইলি সেনা প্রত্যাহার নিশ্চিতে বদ্ধপরিকর। ইসরাইলের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে হামাস বলেছে, গাজায় তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকতেই হবে, এমন দাবি তারা করছে না। যারাই গাজার শাসন ক্ষমতায় আসুক না কেন, সে বিষয়টি ঠিক করতে হবে। হামাস ২০০৭ সাল থেকে গাজা শাসন করে আসছে।

যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ইসরাইলের কাছে চার নিহত জিম্মির মরদেহ হস্তান্তর করেছে হামাস। সে ধারাবাহিকতায় বিলম্বিত হওয়া বন্দিদের সঙ্গে আরও কয়েকশ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেবে ইসরাইল। প্রথম ধাপে ৩৩ জিম্মির বিনিময়ে ইসরাইলি কারাগারে আটক দুই হাজারের মতো ফিলিস্তিনি বন্দি ও কয়েদিদের মুক্তি পাওয়ার কথা। গাজায় সংঘাত থামলেও অধিকৃত পশ্চিম তীরে অভিযান অব্যাহত রেখেছে ইসরাইল। তাদের এই অভিযানে শিশু ও সাবেক বন্দিসহ অন্তত ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ইসরাইলি বাহিনী।

ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ইচ্ছাকৃত গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি নষ্টের অভিযোগ করেছে হামাস। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্য আলজাজিরাকে সাক্ষাৎকারে হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য নাঈম বলেন, নির্ধারিত ৬২০ ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত কোনো আলোচনায় বসবে না তারা।

নাঈম বলেন, যুদ্ধবিরতির পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার আগে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে, আগের পর্যায়ের শর্তগুলো পূরণ হয়েছে কিনা। নেতানিয়াহু স্পষ্টভাবে বার্তা দিচ্ছেন যে, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে চুক্তি ভেস্তে দিচ্ছেন এবং আবার যুদ্ধের জন্য পরিস্থিতি তৈরি করছেন। রো চুক্তির অন্য অংশগুলোর ভবিষ্যৎও তাই অনিশ্চিত। ২০০২ সালের পর প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরে ট্যাংক মোতায়েন করেছে ইসরাইল।

গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে যাওয়ার যে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল, তা অবশেষে কেটে গেছে। গাজা নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাস তাদের হাতে বন্দি তিন ইসরাইলিকে মুক্তি দিয়েছে ১৫ ফেব্রুয়ারী। এর বিনিময়ে ইসরাইলের বন্দিশিবির থেকে মুক্তি পেযছে ৩৬৯ জন ফিলিস্তিনি।
রয়টার্স জানাচ্ছে, তিন ইসরাইলি জিম্মিকে রেডক্রসের হাতে তুলে দেওয়ার আগে গাজার খান ইউনিস শহরে একটি মঞ্চের দিকে তাদের নিয়ে যেতে দেখা যায় হামাস যোদ্ধাদের। সেখানে জমায়েত হওয়া লোকজনের উদ্দেশে তিনজনকে ভাষণ দিতে বলা হয়। তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় বাকি জিম্মি ও বন্দি বিনিময় শেষ করা আহ্বান জানান। এরপর তাদের রেডক্রসের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে মুক্তি পাওয়া তিন জিম্মির নাম প্রকাশ করা হয়েছে। তারা হলেন, সাগ্রই দেকেন চেন, সাশা ক্রপানভ ও ইয়াইর পূর্ন । তাদের ফেরত পাওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছে ইসরাইলি বাহিনীও। জিম্মিদের স্বাগত জানাতে তেল আভিবে জড়ো হয় লোকজন। এর কিছুক্ষণ পরই ইসরাইল পরিচালিত কারাগারে ফিলিস্তিনি বন্দিদের বহনকারী একটি বাস দখলকৃত পশ্চিম তীরের রামাল্লায় প্রবেশ করে। এ সময় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তাদের স্বাগত জানান সেখানে উপস্থিত ফিলিস্তিনিরা। এ ছাড়া নেগেভ মরুভূমিতে অবস্থিত ইসরাইলের একটি কারাগার থেকে কয়েকটি বাসে করে ফিলিস্তিনি বন্দিরা গাজায় পৌঁছান।
দীর্ঘ ১৫ মাসের বেশি সময় ধরে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর গত ১৯ জানুয়ারী থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। এর পর থেকে ছয়বার ইসরাইলি জিম্মি ও ফিলিস্তিনি বন্দি বিনিময় হয়েছে। যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী প্রথম ধাপে ৩৩ জন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়ার কথা হামাসের।
ইসরাইলের আগ্রাসন বন্ধে গাজায় প্রথম দফায় যুদ্ধবিরতি। চুক্তির দ্বিতীয় ধাপ নিয়ে নতুন প্রস্তাব দিয়েছে হামাস। গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং অবরুদ্ধ অঞ্চল থেকে ইসরাইলের সেনা প্রত্যাহারের বিনিময়ে জিম্মিকে মুক্তি দেবে হামাস। এক বিবৃতিতে হামাসের মুখপাত্র হাজেম কাসেম এ ঘোষণা দেন। জানিয়েছেন, হামাস দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত। মধ্যস্থতাকারীদের অনুরোধে তারা মুক্তিপ্রাপ্ত জিম্মি সংখ্যা দ্বিগুণ করবেন। কিন্তু এজন্য ইসরাইলকে তাদের নতুন শর্ত মানতে হবে। হামাস যুদ্ধ বিরতির শর্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। হাজেম কাসেম 'টেলিগ্রাফ'কে জানিয়েছেন, গাজা থেকে হামাসকে সরানোর চিন্তা মূর্খ মনস্তাত্ত্বিক কৌশল ছাড়া কিছুই নয়। গাজা থেকে তাদের কখনোই সরানো যাবে না এবং নিরস্ত্রীকরণও সম্ভব নয়। হামাসের প্রতিরোধ বিদ্যমান থাকবে। হামাসকে সরিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ যদি গাজার স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়, তারা যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। গাজা নিয়ে যে কোনো বন্দোবস্ত ফিলিস্তিনি জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে বলেও জানান।
হাসাস নেতা খলিল আল-হাইয়া জানিয়েছেন, দুই সপ্তাহের পরিবর্তে শনিবার তিন জনের বদলে ছয় জিম্মিকে মুক্তি দেবে তারা এবং পরে চার জনের লাশ ফেরত দেবে। চুক্তির দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়নের জন্য হামাস একদিন আগেই এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। কাসেম বলেন, মধ্যস্থতাকারীদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এবং চুক্তির সব শর্ত বাস্তবায়নে হামাস যে কতটা ইতিবাচক, তার জন্য মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা দ্বিগুণ করা

হয়েছে। মূলত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইসরাইল থেকে প্রতি সপ্তাহে জিম্মি মুক্তির বিষয়টি নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য এবং গাজায় অবশিষ্ট বন্দিদের পরিবার তাদের সবাইকে একসঙ্গে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানানোর পর হামাস সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন কাসেম।

ইসরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রিসভার বৈঠক কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে। কায়রোয় আলোচনার জন্য ইসরাইলি প্রতিনিধিদের এখনো কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে দ্বিতীয় ধাপের মুক্তি ও যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে আলোচনা স্থগিত রয়েছে।

ইসরাইলের হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা ৪৮ হাজার ২৯১। আহত এক লাখ ১১ হাজার ৭২২ জন। ধ্বংস হয়েছে হাজার হাজার ঘরবাড়ি, অবকাঠামো। এ অবস্থায় গাজা পুননির্মাণে ৫৩ দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার খরচ হতে পারে। জানিয়েছে জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বিশ্বব্যাংক। এর মধ্যে আবাসন খাতের জন্য ধরা হয়েছে প্রায় ১৫ দশমিকে দুই বিলিয়ন ডলার। গাজা ও পশ্চিম তীরের দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা মুল্যায়ন করে এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়, ৮ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ৮ অক্টোবর ২০২৪ সালের মধ্যে গাজায় ইসরাইলের হামলায় ৪৯ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে। গাজায় যুদ্ধ বিরতি চুক্তির মধ্যেও বিভিন্ন স্থানে হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরাইলি আইডিএফ। গাজায় ২৬৬ বার যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে ইসরাইল। ১৯ জানুয়ারী থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধবিরতির মধ্যে ইসরাইলি কারাগার থেকে এক হাজার ১৩৫ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। ■

আল ফালাহ বিজ্ঞাপন

প্রশ্ন-১ ঃ আমার অসুস্থতার কারণে রমাযানের ফরয রোযা কাযা হয়ে যায়। শাওয়াল মাসে কাযা রোযা রাখলে শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখা খুবই কষ্টকর এমনকি সম্ভব নাও হতে পারে। সার কথা হলো, কাযা রোযা রাখলে শাওয়ালের ৬ রোযা রাখা হবে না, ছয় রোযা রাখলে কাযা রোযা রাখা হবে না। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

আবদুল হালিম
চান্দিনা, কুমিল্লা

উত্তর ঃ হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখল অতঃপর শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখল, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।'

এই হাদিস থেকে জানা যায়, রমাযানের রোযার পরেই শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখতে হবে। এই হাদিস থেকে একথাও বুঝা যায়, কারো রমাযানের কিছু রোযা ছুটে গেলে বা কাযা হয়ে গেলে শাওয়াল মাসেই শাওয়াল মাসের সুন্নাত রোযার আগেই সেগুলোর কাযা আদায় করতে হবে। কেননা রমাযানের রোযা ফরয রোযা এবং রমাযানের রোযার কাযা আদায় করাও ফরয। আর ফরযের গুরুত্ব সুন্নাতের চাইতে বেশি। তাই আগে ফরযের কাযা আদায় করা চাই। কিন্তু যদি কারো অবস্থা এমন হয় যে, শাওয়াল মাসেই তার রমাযানের ছুটে যাওয়া রোযাগুলোর কাযা আদায় করতে গেলে শাওয়াল মাসের ছয়টি সুন্নত রোযা রাখা সম্ভব হবে না তাহলে তিনি শাওয়াল মাসে রমাযানের কাযা রোযা আদায় না করে শাওয়ালের সুন্নাত রোযাগুলো রাখতে পারেন। কেননা শাওয়ালের সুন্নত রোযা শাওয়াল মাসেই রাখতে হবে। পক্ষান্তরে রমাযানের কাযা রোযাগুলো রাখার সুযোগ তিনি পরেও পাবেন। এমনকি কারো বিশেষ কোনো ওজর থাকলে তিনি আগামী শা'বান মাস পর্যন্ত কাযা রোযাগুলো রাখার সুযোগ পাবেন।

প্রশ্ন-২ ঃ এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ থাকার কারণে বিগত কয়েক বছর রোযা রাখতে পারেনি। সুস্থ হলে কাযা আদায় করবে এই নিয়তে এ পর্যন্ত কোন রোযার ফিদিয়াও দেয়নি। বর্তমানে সে সুস্থতা ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে এবং অতীত জীবনের কাযা রোযাগুলো আদায় করার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ। এখন সে ফিদিয়া দিতে চায়। ফিদিয়া কি দিয়ে দিতে হবে এবং কি পরিমাণ দিতে হবে?

সুমাইয়া আক্তার
হালিশহর, চট্টগ্রাম

উত্তর ঃ রমাযান মাসের রোযা রাখা ফরয। কিন্তু কেউ যদি বিশেষ কোনো ওজর যেমন অসুস্থতার কারণে রোযা রাখতে না পারে তাহলে সুস্থ হওয়ার পর তার কাযা আদায় করতে হবে। কিন্তু তার যদি অসুস্থতা দীর্ঘ ও চলমান হয় তাহলে চিকিৎসা করবে এবং সুস্থতা ফিরে পাওয়ার অপেক্ষা করবে। সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা যদি একেবারেই না থাকে তাহলে হিসেব

করে অতীত বছরগুলোর না রাখা রোযাগুলোর ফিদিয়া দিয়ে দেবে।

ফিদিয়া যে বছরের রোযারই দেওয়া হোক না কেন বর্তমান বাজার মূল্য ধরে দিতে হবে।

রোযার ফিদিয়ার পরিমাণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ–

"তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই দিনগুলির রোযা পূরণ করবে। আর যারা রোযা রাখতে অক্ষম তারা যেন ফিদিয়া দিয়ে দেয়। এক রোযার ফিদিয়া একজন দরিদ্রকে খাদ্য দান করা। - সূরা আল বাকারা : ১৮৪

কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী একটা রোযার ফিদিয়া হলো, একজন দরিদ্রকে মধ্যম মানের দু'বেলা খাবার খাওয়ানো বা দু'বেলা খাবার দান করা কিংবা রমাযানের রোযার ফিতরা (সাদাকুল ফিতর) পরিমাণ খাদ্য শস্য কিংবা তার মূল্য দান করা।

প্রশ্ন-৩ ঃ আমার মা, আমার বড় বোন ও তার স্বামী ওমরা পালন করার উদ্দেশ্যে মক্কা মোকাররমায় যাচ্ছেন। আমি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী। আমি কি তাদের সাথে ওমরা পালন করার জন্য মক্কা মোকাররমায় যাইতে পারবো?

আবু নাসের
মীরবাগ, ঢাকা

উত্তর ঃ যে কোন নারীর সফর করার জন্য তার সাথে তার স্বামী অথবা তার প্রাপ্তবয়স্ক মাহরাম পুরুষ সঙ্গে থাকা জরুরী। তাদের সাথে আপনি ওমরা করতে গেলে আপনার সফর সঙ্গী হিসেবে আপনার সাথে থাকবেন আপনার মা ও বড় বোন। তারা দু'জনই নারী আর থাকছেন আপনার বড় বোনের স্বামী। তিনি আপনার মাহরাম নয়। অতএব এদের সাথে ওমরায় যাওয়া আপনার জন্য জায়েয হবে না।

হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ " لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِنَّ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا . قَالَ " انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

আবু মা'বাদ বর্ণনা করেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা) কে বলতে শুনেছি, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুতবার সময় বলতে শুনেছি, কোন পুরুষ যেন কোন স্ত্রী লোকের সাথে তার মহারামের উপস্থিতি ছাড়া নির্জনে সাক্ষাৎ না করে। আর কোন মহিলা যেন সাথে নিজের কোন মাহরাম ছাড়া সফর না করে। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার স্ত্রী হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে এবং আমার নাম এই যুদ্ধে তালিকাভুক্ত করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যাও তোমার স্ত্রীর

সাথে হাজ্জ করো"। সহিহ মুসলিম, অধ্যায় : হাজ্জ, অনুচ্ছেদ : ৭৪, হাজ্জ ও অন্য কোথাও ভ্রমণকালে মহিলাদের সাথে মাহরাম পুরুষ থাকার বর্ণনা, হাদিস নং (৩২৭২) ৪২৪ (১৩৪১)

এ হাদিস প্রমাণ করে যে, মাহরাম পুরুষ সফর সঙ্গী ছাড়া কোন নারীর সফরে যাওয়া জায়েয নয়, মাহরাম পুরুষ সফরসঙ্গী ছাড়া হাজ্জ ও উমরার সফরে যাওয়াও জায়েয হবে না ।

আর এখানে মা ও বড় বোনের সাথে থাকছেন বড় বোনের স্বামী অর্থাৎ দুলাভাই। দুলাভাই ও দেবরের সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে, তারা হলো অর্থাৎ দুলাভাই শীলিকাদের জন্য এবং দেবর ভাইয়ের স্ত্রীদের জন্য মৃত্যুতুল্য।

আমাদের সমাজে সচরাচর এই দুই শ্রেণীর আত্মীয়দের সাথে মেয়েদের পারস্পরিক ঠাট্টা ও রসিকতা চলে অবাধে। এমনকি এটা কখনো দুর্ঘটনারও কারণ হয়। ইসলাম এটাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম করে এই শ্রেণীর আত্মীয়কে মেয়েদের জন্য মৃত্যুতুল্য বলে ঘোষণা করেছে।

প্রশ্ন-৪ ঃ কোনো ব্যক্তির উপর হাজ্জ ফরয হয়েছে। অপরদিকে এক মেয়ে বিয়ের উপযোগী হয়েছে। মেয়েকে বিয়ে দিতে গেলে হাজ্জ করা হয় না। কারণ বিয়েতে সব টাকা খরচ হয়ে যাবে। হাজ্জ করার টাকা থাকে না। এমতাবস্থায় করণীয় কী?

সাব্বির হোসেন
শাহরাস্তি, চাঁদপুর

উত্তর ঃ হাজ্জের সময় যদি নিকটবর্তী হয়ে যায় তাহলে তিনি আগে হাজ্জ করবেন। আর হজ্জের সময় যদি আরো পরে হয় তাহলে মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন করে হাজ্জে যাবেন। মেয়ের বিয়েতে হাজ্জের টাকা খরচ করে হাজ্জ বিলম্ব বা অনিশ্চিত করা যাবেনা, বরং সুন্নাত তরীকায় ও অল্প খরচে বিয়ে সম্পন্ন করতে হবে। আমাদের দেশে বিয়ে শাদীতে সামাজিক অবাঞ্চিত ও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এবং ঘৃণ্য কু প্রথাসমূহ যুক্ত হয়ে বিয়ে সাদীকে কঠিন থেকে কঠিনতর এবং বরকতহীন করে তুলেছে আর উন্মুক্ত ও সহজলভ্য এবং অবাধ করেছে চরম ঘৃণ্য এবং ইসলামে ও কুরআন হাদীসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কর্তৃক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ পাপাচার যেনা ও ব্যভিচারকে। বিয়ে শাদী যত সহজ হবে সমাজ তত পাপমুক্ত ও পবিত্র হবে।

বাংলাদেশের মুসলমান তথা যুবকশ্রেণী এ সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত, আমরা যৌতুককে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবো এবং বিবাহকে সহজ ও সুন্নাত তরীকায় সম্পন্ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবো।

প্রশ্ন-৫ ঃ (ক) যেই জমির কর বা খাজনা পরিশোধ করা হয়, সেই জমির ফসলের ওপর যাকাত ফরয হয় কিনা? যদি আদায় করতে হয়, তাহলে আম, কাঁঠাল, লিচু, মিষ্টি কুমড়া, শসা ইত্যাদি ফসলের যাকাত কি নিয়মে আদায় করতে হবে? দলীলসহ জানালে উপকৃত হবো।

(খ) যেই জমির ফসল বৃষ্টির পানিতেই উৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেচ দেয়া লাগে না কিন্তু অধিক ফসলের জন্য সার এবং পোকা-মাকড় দমনের জন্য বিষ প্রয়োগ করতে হয়– এইরূপ জমির ফসলের যাকাত দেয়ার নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।

আবু নাসের, তেজগাঁও, ঢাকা

উত্তর ঃ (ক) খাজনা সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত কর। ওশর মুসলমানদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি ফরয ইবাদাত। খাজনা আদায় করার কারণে ওশর মাফ হওয়ার বা আদায় না করার প্রশ্ন অবান্তর। অধিকাংশ ইমাম এবং হানাফী মাযহাবের দু'জন ইমাম– ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ)-এর মতে শাক-সবজী ও পচনশীল ফলমূলের ওপর ওশর ফরয নয়। এ মতে শাক সবজী ও ফলমূলের ওশর দিতে হবে না। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতে শাক সবজী ও ফলমূলেরও ওশর আদায় করতে হবে।

(খ) যে জমির ফসল বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন হয় সেচ দেয়া লাগে না তার যাকাত হবে উৎপাদিত ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ প্রতি দশ মনে এক মন। সার ও কীটনাশক দেয়ার জন্য এ পরিমাণের তারতম্য হবে না।

প্রশ্ন-৬ ঃ (১) হাজ্জে যাওয়ার পথে কারো যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে সে কি হাজ্জের ফরযিয়াত থেকে মুক্তি পাবে?

(২) মৃত্যুর কারণে সে যে হাজ্জ করতে পারলো না, এতে কি তার কোনো পাপ হবে?

সুমন মিয়া, বগুড়া

উত্তর ঃ (১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার এই অধিকার রয়েছে যে, যার এই ঘর পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য আছে, সে যেনো এর হাজ্জ সম্পন্ন করে। সূরা-আল ইমরান-৯৭

যার উপর হাজ্জ ফরয হয়, হাজ্জ করার মাধ্যমেই তার এ ফরয আদায় হবে। আর হাজ্জ করার জন্য লোকটি বাড়ি থেকে মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন। কিন্তু পথে মারা যাওয়ার কারণে তার হাজ্জ করা হলো না বিধায় তার উপর হাজ্জ ফরয থেকেই যায়। হাজ্জে যাওয়ার পথে মারা যাওয়ার কারণে সে হাজ্জের ফরযিয়াত থেকে ছাড় পাবেনা। বিধায় তার উত্তরসূরীদের কর্তব্য হবে তার রেখে যাওয়া সম্পদ দ্বারা তার পক্ষ থেকে বদলী হাজ্জ করা বা ইতপূর্বে নিজের হাজ্জ করেছে এমন কাউকে দিয়ে বদলী হাজ্জ করানো।

উত্তর ঃ (২) যে বছর তার উপর হাজ্জ ফরয হয় তিনি যদি সে বছরই হাজ্জের সময় হাজ্জ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান তাহলে তার কোনো পাপ হবেনা।

তবে যে বছর তার উপর হাজ্জ ফরয হয় সে বছর হাজ্জে না গিয়ে যদি বিলম্বে হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন অতঃপর হাজ্জ করার আগেই মারা যান তাহলে বিলম্ব করার কারণে তিনি গুনাহগার হবেন। অবশ্য হাজ্জ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার জন্য তিনি সাওয়াব পাবেন। কিন্তু হাজ্জের ফরযিয়াত থেকে তিনি ছাড় পাবেননা। তার উপর হাজ্জ ফরয থেকে যাবে। (দেখুন, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (র) মাজমূউ ফাতাওয়া, খ. ২৬, পৃ. ২১) ■

ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত বই পড়ুন, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন।

পাইকারী ৩৭% এবং খুচরা ২৫% কমিশনে ক্রয় করুন

নং	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	দারসুল কুরআন সংকলন-১-২	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১৪৫/-
২	দারসুল কোরআন সিরিজ-১-৩	প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ	৪১০/
৩	দারসুল হাদীস সিরিজ-১-৩	ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া	৩৬০/-
৪	কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা	খুররম মুরাদ	১৩০/-
৫	আল কুরআন এক মহাবিস্ময়	ড. মরিস বুকাইলি	১০০/-
৬	সাহীহ্ আল্ বুখারী ১-৫	ইমাম বুখারী (রহ)	২৭৭০/-
৭	সহীহ মুসলিম ১-৮	ইমাম মুসলিম (র)	৪১২০/
৮	জামে আত-তিরমিযী ১-৬	ইমাম তিরমিযী (র)	২২০০/-
৯	সুনান আবু দাউদ ১-৬	ইমাম আবূ দাউদ (র)	২২৮০/-
১০	সুনান আন-নাসাঈ ১-৬	ইমাম নাসাঈ (র)	২১৬০/-
১১	মুসনাদে আহমাদ (১)	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)	৩৫০/
১২	রিয়াদুস সালেহীন ১-৪	ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)	১৩০০/-
১৩	শু'আবুল ঈমান	ইমাম বাইহাকী (র)	১২০/-
১৪	সীরাতে ইবনে হিশাম	আকরাম ফারুক অনূদিত	৪৫০/-
১৫	আবু বাকর আছ্ছিদ্দিক (রা)	ড. আহমদ আলী	৭৫০/-
১৬	উসমান ইবনু আফ্ফান (রা)	ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক	৩৫০/-
১৭	আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ১-৭	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	২৩৪০/-
১৮	তাবি'ঈদের জীবনকথা ১-৪	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	১১২০/-
১৯	ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১৮০/-
২০	ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ধারণা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১৬০/-
২১	কবিরা গুনাহ	ইমাম আয যাহাবী (র)	১৮০/-
২২	আমরা সেই সে জাতি (১-৩)	আবুল আসাদ	৩৮০/-
২৩	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস	আব্বাস আলী খান	৪২০/-
২৪	আল আকসা মসজিদের ইতিকথা	এ এন এম সিরাজুল ইসলাম	৮০/-
২৫	উসমানী খিলাফাতের ইতিকথা	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭৫/-
২৬	মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোষাক	শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (র)	৬০/-
২৭	ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী	ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী	১৪০/-

২৮	নারী অধিকার পর্দা ও নারী পুরুষে মুসাফাহা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১০০/-
২৯	পর্দার আসল রূপ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৩০/-
৩০	দি সোর্ড অব আল্লাহ	লে. জেনারেল এ.আই. আকরাম (অব.)	৩৫০/-
৩১	দৈনন্দিন জীবনে তাকওয়া	ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক	১৪০/-
৩২	মদিনা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	২০০/-
৩৩	মক্কা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	৬০০/-
৩৪	ইবনুল কায়্যিম (রহ)	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	৪৪০/-
৩৫	আদর্শ মানব মুহাম্মাদ (সা)	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৩৬	আল্লাহর দিকে আহ্বান	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৪০/-
৩৭	ইসলামী নেতৃত্ব	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৬০/-
৩৮	রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পঠিত দু'আ	ইমাম ইবনে কাইয়েম (র)	১৩০/-
৩৯	ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট ও কর্মপদ্ধতি	শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪০	সুদ	শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪১	আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (১-৩)	আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানাবী (র)	৪২০/-
৪২	আল্লাহর পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৩০/-
৪৩	সফল জীবনের পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৪৪	রাসূলুল্লাহর শিক্ষাদান পদ্ধতি	ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ	৪০০/-
৪৫	ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা	ড. আহমদ আলী	৩০০/-
৪৬	তাযকিয়াতুন নাফস	ড. আহমদ আলী	৩০০/-
৪৭	ইসলামের শাস্তি আইন	ড. আহমদ আলী	২২০/-
৪৮	ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা ও সংস্কার	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	২২০/-
৪৯	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম	৩৫/-
৫০	আল্লাহর হক মানুষের হক	জাবেদ মুহাম্মাদ	২৫০/-
৫১	ইলমুল ফিকহ ঃ সূচনা ও ক্রমবিকাশ	ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক	৪০০/-
৫২	ইমাম বুখারী (রহ.) জীবনি ও হাদীস চর্চা	ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন	৪০০/-
৫৩	নামায কায়েম কর	অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন	৩০/-
৫৪	রোযার তাৎপর্য ও বিধিবিধান	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১১০/-
৫৫	গবেষণাপত্র সংকলন (১-২৫)	সংকলিত	২১৯৫/-
৫৬	যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৬০/-
৫৭	ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত	জাবেদ মুহাম্মাদ	২৬০/-

যোগাযোগ : ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, (নীচতলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭৪১ ৬৭৭৩৯৯
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০
E-mail : dhakabic@gmail.com, web : www.dhakabic.com